সাহিত্য পরিচয়



Recommended by the West Bengal Board of Secondary
Education Vide Notification No. 76/7/T.B./74
Dated 24.12.76 (Bengali Text-VII)
[পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রবর্তিত নূতন পাঠ্যক্রম অনুসারে
সপ্তম শ্রেণীর জন্য লিখিত]

সাহিত্য পরিচয়

(সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য)

অরবিন্দ কর, বি. এ. (অনার্স), বি. টি., এম. এ. (বাংলা)
বাংলা ভাষার শিক্ষক, কুমারগ্রামদুয়ার মদন সিং
হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, জলপাইগুড়ি।
ও
ভামিনীনাথ মিত্র, এম. এ.
প্রাক্তন শিক্ষক, সাহাপুর হরেন্দ্রনাথ বিদ্যাপীঠ।

চক্রবর্তী এণ্ড কোং
৮সি, টেমার লেন,
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
পি. চক্রবর্তী
৮সি, টেমার লেন,
কলকাতা-৭০০০০৯

তৃতীয় মুদ্রণ : ১৯৮১ সেপ্টেম্বর

[redacted]

মুদ্রক :
অসিত সরকার
তাপসী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

বাংলা পাঠ্যক্রম

গদ্যাংশের জন্য ৫০ পৃষ্ঠা, আর পদ্যাংশের জন্য ৩০ পৃষ্ঠা, মোট ৮০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ হইবে। গদ্যাংশের মধ্যে থাকিবে: (ক) নানান সাহিত্যিক বিষয়—প্রাকৃতিক দৃশ্য, গল্প, স্মৃতিচারণ, ভ্রমণ-কাহিনী প্রভৃতি; (খ) স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক বিষয় (দেশীয় কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদি ও জাতীয় গৌরববিষয়ক রচনা; (গ) জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন-বৃত্তান্ত ও সংগ্রামের কথা (সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মুখ্যতঃ ঊনবিংশ শতক হইতে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত সময়ের কথা); (ঘ) মহৎ জীবন কথা (সর্বভারতীয় মহাপুরুষদিগের জীবনবৃত্তান্ত); (ঙ) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অভিযান এবং (চ) একটি নাট্যাংশ।

পদ্যাংশের জন্য প্রসিদ্ধ কবিগণের বিভিন্ন ভাব ও ছন্দের কবিতা সংকলন করিতে হইবে।

গদ্যাংশে সাধু ও চলিত উভয় রীতির রচনা থাকা আবশ্যক। প্রসিদ্ধ লেখকবর্গের রচনা সংকলিত হইবে। সংকলকের নিজস্ব রচনাও থাকিতে পারে। বিস্তৃত অনুশীলনী থাকিবে এবং অনুশীলনী ও চিত্রাদির জন্য অতিরিক্ত ৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যোগ করা চলিবে।

সূচীপত্র

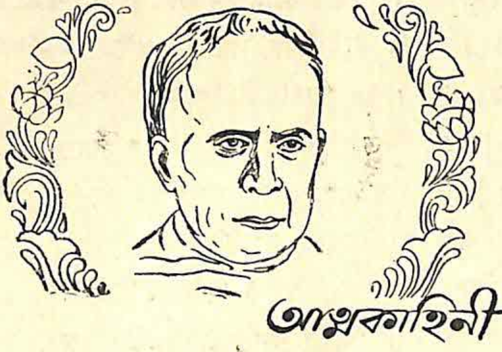
গদ্যাংশ

বিষয়		পৃষ্ঠা
আত্মকাহিনী	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১
গঙ্গাতীরের শোভা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫
অদৃশ্য বিচারক	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯
লণ্ডন শহর	অন্নদাশংকর রায়	১৩
বিদ্যাসাগর	বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)	১৮
নিউটনের কীর্ত্তি	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২৩
শ্রীরামকৃষ্ণ	স্বামী বিবেকানন্দ	২৯
নেতাজী সুভাষচন্দ্র	চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২
প্রাচীন বাংলার শিল্প ও বাণিজ্য	মিহির মজুমদার	৩৫
এভারেস্ট বিজয়	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৩৮
দেশের শ্রীবৃদ্ধি	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪৩
বাঙালীর শিল্পোদ্যম	বিনয় ঘোষ	৪৬

পদ্যাংশ

একলব্য	কাশীরাম দাস	৪৯
জন্মভূমির প্রতি	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৫০
বঙ্গে শরৎ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫২
ঝিঙে-ফুল	নজরুল ইসলাম	৫৪
রাখাল ছেলে	জসিমউদ্দিন	৫৬
রানার	সুকান্ত ভট্টাচার্য	৫৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
ভাড়াটে কুঠি	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৫৯
ছিন্ন মুকুল	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৬১
কামনা	হুমায়ুন কবির	৬৩
ভারতের মানচিত্র	যোগীন্দ্রনাথ বসু	৬৪
সুখ	কামিনী রায়	৬৮
অনুশীলনী		৭০



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

[**লেখক পরিচিতি ঃ** ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতী দেবী। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পান। বিদ্যার মতই তাঁর অসামান্য দয়াদাক্ষিণ্য, মাতৃভক্তি, দান ও তেজস্বিতা গল্পকথায় পরিণত হয়েছে। সমাজ-সংস্কারকরূপে এবং শিক্ষাবিস্তারে তাঁর দান অতুলনীয়। 'আখ্যানমঞ্জরী', 'বোধোদয়', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁর রচিত 'বর্ণপরিচয়' (১ম ও ২য় ভাগ) বাংলা শেখার পক্ষে অপরিহার্য গ্রন্থ। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

বড়বাজারের ৺জগদ্দুর্লভ সিংহ মহাশয়ের পরিবারের মধ্যে অবস্থিত হইয়া, পরের বাটীতে আছি বলিয়া একদিনের জন্যও আমার মনে হইত না, সকলেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ কস্মিনকালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও

যত্ন বিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্ন ভাব ছিল না। ফল কথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা, প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্য মূর্তি আমার হৃদয়মন্দিরে দেবীমূর্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্তন করিতে করিতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই। আমি পিতামহী দেবীর একান্ত প্রিয় ও নিতান্ত অনুগত ছিলাম। কলিকাতায় আসিয়া প্রথমতঃ কিছুদিন তাঁহার জন্য যারপরনাই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। সময়ে সময়ে তাঁহাকে মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতাম। কিন্তু দয়াময়ী রাইমণির স্নেহে ও যত্নে, আমার সেই বিষম উৎকণ্ঠা ও উৎকট অসুখের অনেক অংশের নিবারণ হইয়াছিল।

প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময় সিয়াখালায় সালিখার বাঁধা রাস্তায় উঠিয়া, বাটনাবাটা শিলার মতো একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পোঁতা দেখিতে পাইলাম। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, "বাবা, রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন ?" তিনি আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, "ও শিল নয়. উহার নাম মাইল-ষ্টোন।" আমি বলিলাম, "মাইল ষ্টোন কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।" তিনি বলিলেন, "এটি ইংরাজী কথা, মাইল শব্দের অর্থ আধ ক্রোশ ; ষ্টোন শব্দের অর্থ পাথর ; এই রাস্তার আধ ক্রোশ অন্তরে অন্তরে এক একটি পাথর পোতা আছে ; উহাতে এক, দুই, তিন প্রভৃতি অঙ্ক খোদা রহিয়াছে। এই পাথরের অঙ্ক উনিশ, ইহা

দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে এখান হইতে কলিকাতা উনিশ মাইল অর্থাৎ সাড়ে নয় ক্রোশ।" এই বলিয়া তিনি আমাকে ঐ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন।

নামতায় 'একের পিঠে নয় উনিশ' ইহা শিখিয়াছিলাম। দেখিবামাত্র আমি প্রথমে এক অঙ্কের, তৎপরে নয় অঙ্কের উপর হাত দিয়া বলিলাম, তবে এটি ইংরাজীর এক, আর এটি ইংরাজীর নয়। অনন্তর বলিলাম, "তবে বাবা, ইহার পর যে পাথরটি আছে তাহাতে আঠার আর পরেরটিতে সতর,—এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক পর্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইব। তিনি বলিলেন, "আজ দুই পর্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইব। প্রথম মাইল ষ্টোন যেখানে পোতা আছে, আমরা সেদিক দিয়া যাইব না। যদি একদিন চাও, একদিন দেখাইয়া দিব।" আমি বলিলাম' "সেটি দেখাইবার দরকার নাই, এক অঙ্ক এটিতেই দেখিতে পাইয়াছি। বাবা, আজ পথে যাইতে যাইতেই আমি ইংরাজী অঙ্কগুলি চিনিয়া ফেলিব।"

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রথম মাইল ষ্টোনের নিকটে গিয়া আমি অঙ্কগুলি দেখিতে ও চিনিতে আরম্ভ করিলাম। মনবেড় চটিতে দশম মাইলষ্টোন দেখিয়া পিতৃদেবকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলাম, "বাবা আমার ইংরাজী অঙ্ক চিনা হইল।" পিতৃদেব বলিলেন, কেমন চিনিয়াছ, তাহা পরীক্ষা করিতেছি। এই বলিয়া তিনি নবম, অষ্টম, সপ্তম, এই তিনটি মাইল-ষ্টোন ক্রমে ক্রমে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আমি এটি আট, সাত, এইরূপ বলিলাম। পিতৃদেব ভাবিলেন, আমি যথার্থ ই অঙ্কগুলি চিনিয়াছি, অথবা নয়ের পূর্বে আট, আটের পূর্বে সাত অবধারিত আছে, ইহা জানিয়া, চালাকি করিয়া নয়, আট, সাত বলিতেছি। যাহা হউক, ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কৌশল করিয়া তিনি আমাকে ষষ্ঠ মাইল ষ্টোনটি দেখিতে দিলেন না; অনন্তর পঞ্চম মাইল ষ্টোনটি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কোন্ মাইল

ষ্টোন বল দেখি ?" আমি দেখিয়া বলিলাম, বাবা, এই মাইল ষ্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে, এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ খুদিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া পিতৃদেব ও তাহার সমভিব্যহারীরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বীরসিংহের গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও ঐ সমভিব্যহারে ছিলেন, তিনি আমার চিবুক ধরিয়া "বেশ, বাবা বেশ" এই বলিয়া অনেক আশীর্বাদ করিলেন এবং পিতৃদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, "দাদা মহাশয়, আপনি ঈশ্বরের লেখাপড়া বিষয়ে যত্ন করিবেন। যদি বাঁচিয়া থাকে, মানুষ হইতে পারিবেক।" যাহা হউক, আমায় পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা সকলে যেমন আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আহ্লাদ দেখিয়া আমিও তদনুরূপ আহ্লাদিত হইয়াছিলাম।

Vidyasagara's memories of his early life.



[**লেখক পরিচিতি ঃ** ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অতি অল্প বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে কবিত্বশক্তির স্ফুরণ ঘটে। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান অতুলনীয়। 'সোনার তরী', 'বলাকা', 'কথা ও কাহিনী' কবির বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। কাব্য ছাড়াও নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী রচনা এবং সঙ্গীতচর্চাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কবির মৃত্যু হয়।]

শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা এমন আর কোথায় আছে ? গাছপালা ছায়া, কুটির—নয়নের আনন্দ—অবিরল সারি সারি দুইধারে বরাবর চলিয়াছে—কোথাও বিরাম নাই। কোথাও তটভূমি সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া গঙ্গার কোলে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে। কোথাও বা একেবারে নদীর জল পর্যন্ত ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া আসিয়াছে—জলের উপর তাহাদের ছায়া অবিশ্রান্ত দুলিতেছে ; কতকগুলি সূর্যকিরণ ছায়ার মাঝে মাঝে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, আর বাকী কতকগুলি গাছপালার কম্পমান কচি মসৃণ সবুজ পাতার উপর চিক্-

চিক্ করিয়া উঠিতেছে। একটা নৌকা তাহার কাছাকাছি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে, সে সেই ছায়ার নিচে, অবিশ্রাম জলের কুল-কুল শব্দে, মৃদু মৃদু দোল খাইয়া বড় আরামের ঘুম ঘুমাইতেছে। তাহার আর একপাশে বড় বড় গাছের অতি ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ভাঙা ভাঙা বাঁকা একটা পদচিহ্নের পথ জল পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সেই পথ দিয়া গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁখে করিয়া জল লইতে নামিতেছে, ছেলেরা কাদার উপরে পড়িয়া জল ছোড়াছুড়ি করিয়া সাঁতার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে।

প্রাচীন ভাঙা ঘাটগুলির কি শোভা। মানুষেরা যে এ ঘাট বাঁধিয়াছে তাহা একরকম ভুলিয়া যাইতে হয়; এও যেন গাছপালার মত গঙ্গাতীরের নিজস্ব। ইহার বড় বড় ফাটলের মধ্য দিয়া অশ্বত্থ গাছ উঠিয়াছে, ধাপগুলির ইটের ফাঁক দিয়া ঘাস গজাইতেছে—বহু বৎসরের বর্ষার জলধারায় গায়ের উপরে শেওলা পড়িয়াছে—এবং তাহার রঙ চারিদিকের শ্যামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সহজে মিশিয়া গিয়াছে। গ্রামের যে সকল ছেলে-মেয়েরা নাহিতে বা জল লইতে আসে, তাহাদের সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা কিছু সম্পর্ক পাতানো আছে—কেহ ইহার নাতিনী, কেহ ইহার মা-মাসী। তাহাদের দাদা মহাশয় ও দিদিমারা যখন এতটুকু ছিল তখন ইহারই ধাপে বসিয়া খেলা করিয়াছে, বর্ষার দিনে পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর সেই যে, যাত্রাওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পৈঠার উপর বসিয়া বেহালা বাজাইয়া গৌরী রাগিণীতে 'গেল গেল দিন' গাহিত ও গাঁয়ের দুই চারজন লোক আশে পাশে জমা হইত, তাহার কথা আজ আর কাহারও মনে নাই।

গঙ্গাতীরের ভগ্ন দেবালয়গুলির যেন বিশেষ কি মাহাত্ম্য আছে। তাহাদের মধ্যে আর দেব-প্রতিমা নাই, কিন্তু তাহারা নিজেরাই জটা-জুটবিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষির মত অতিশয় ভক্তিভাজন ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। এক এক জায়গায় লোকালয়—সেখানে জেলেদের

নৌকা সারি সারি বাঁধা রহিয়াছে—কতকগুলি জলে, কতকগুলি ডাঙার তোলা, কতকগুলি তীরে উপুড় করিয়া মেরামত করা হইতেছে ; তাহাদের পাঁজরা দেখা যাইতেছে। কুঁড়ে ঘরগুলি কিছু ঘন ঘন, কাছাকাছি—কোন কোনটা বাঁকাচোরা বেড়া দেওয়া। দুই চারিটি গরু চলিতেছে। গ্রামের দুই একটা শীর্ণ কুকুর নিষ্কর্মার মত গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একটা উলঙ্গ ছেলে মুখের মধ্যে আঙুল পুরিয়া বেগুন ক্ষেতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া আমাদের জাহাজের দিকে চাহিয়া আছে।

হাঁড়ি ভাসাইয়া লাঠি-বাঁধা ছোট ছোট জাল লইয়া জেলেদের ছেলেরা ধারে ধারে চিংড়িমাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে। সম্মুখে, তীরে বটগাছের জালবদ্ধ শিকড়ের নিচ হইতে নদীস্রোত মাটি ক্ষয় করিয়া লইয়া গিয়াছে ও সেই শিকড়গুলির মধ্যে একটি নিভৃত আশ্রয় নির্মিত হইয়াছে। একটি বুড়ি তাহার দুই চারটি হাঁড়িকুঁড়ি ও একটি চট লইয়া তাহার মধ্যে বাস করে।

আবার আর এক দিকে চড়ার উপর বহুদূর ধরিয়া কাশবন—শরৎকালে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে, তখন বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোলে হাসির সমুদ্র তরঙ্গ উঠিতে থাকে। যে কারণেই হউক, গঙ্গার ধারের ইটের পাঁজাগুলি আমার দেখিতে বেশ ভাল লাগে। তাহাদের আশেপাশে গাছপালা থাকে না—চারিদিকে পোড়ো জায়গা এবড়োথেব্‌ড়ো—ইতস্ততঃ কতকগুলো ইট খসিয়া পড়িয়াছে—অনেকগুলি ঝামা ছড়ানো—স্থানে স্থানে মাটি কাটা—এই অনুর্বরতাও বন্ধুরতারা মধ্যে পাঁজাগুলো কেমন হতভাগ্যের মত দাঁড়াইয়া থাকে।

গাছের শ্রেণীর মধ্যে হইতে শিবের দ্বাদশ মন্দির দেখা যাইতেছে। সম্মুখে ঘাট, নহবৎখানা হইতে নহবৎ বাজিতেছে। তাহার ঠিক পাশেই খেয়াঘাট। কাঁচা ঘাট, ধাপে ধাপে তালগাছের গুড়ি দিয়া বাঁধানো। আরও দক্ষিণে কুমারদের বাড়ি, চাল হইতে কুমড়া

ঝুলিতেছে। একটি প্রৌঢ় কুটিরের দেওয়ালে গোবর দিতেছে—প্রাঙ্গণ পরিষ্কার, তক্‌তক্‌ করিতেছে—কেবল একপ্রান্তে মাচার উপর লাউ লতাইয়া উঠিতেছে, আর একদিকে তুলসীতলা।

সূর্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই, সে বাঙলার সৌন্দর্য দেখে নাই। স্বর্ণচ্ছটায় ম্লান সন্ধ্যালোকে দীর্ঘ নারিকেলের গাছগুলি, মন্দিরের চূড়া, আকাশের পটে আঁকা নিস্তব্ধ গাছের মাথাগুলি, স্থির জলের উপরে লাবণ্যের মত সন্ধ্যার আভা—সুমধুর বিরাম, নির্বাপিত কলরব, অগাধ শান্তি—সে সমস্ত মিলিয়া ছায়াপথের পরপারবর্তী সুদূর শান্তিনিকেতনে একখানি ছবির মত পশ্চিম দিগন্তের ধারটুকুতে আঁকা দেখা যায়। ক্রমে সন্ধ্যার আলো মিলাইয়া যায়, বনের মধ্যে এদিকে-ওদিকে এক একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সহসা দক্ষিণের দিক হইতে একটা বাতাস উঠিতে থাকে, পাতা ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠে, অন্ধকারে বেগবতী নদী বহিয়া যায়, কুলের উপরে অবিশ্রাম তরঙ্গ-আঘাতে ছল্‌ছল্‌ শব্দ হইতে থাকে। আর কিছু ভাল দেখা যায় না, শোনা যায় না—কেবল ঝিঁ ঝিঁ-পোকার শব্দ উঠে—আর জোনাকিগুলি অন্ধকারে জ্বলিতে-নিভিতে থাকে। আরো রাত্রি হয়। ক্রমে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ ঘোর অন্ধকারে অশ্বত্থগাছের মাথার উপর দিয়া ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতে থাকে, নিম্নে বনের শ্রেণীবদ্ধ অন্ধকার, আর উপরে ম্লান চন্দ্রের আভা। খানিকটা আলো অন্ধকার ঢালা গঙ্গার মাঝখানে একটা জায়গায় পড়িয়া তরঙ্গে তরঙ্গে ভাঙিয়া ভাঙিয়া যায়। ওপারের অস্পষ্ট বনরেখার উপর আর খানিকটা আলো পড়ে—সেইটুকু আলোতে ভাল করিয়া কিছুই দেখা যায় না, কেবল ওপারের সুদূরতা ও অস্পষ্টতাকে মধুর রহস্যময় করিয়া তোলে। এ-পারে নিদ্রার রাজ্য আর ও-পারে স্বপ্নের দেশ বলিয়া মনে হইতে থাকে।

Description of beauties of the banks of the Ganges.

অদৃশ্য বিচারক

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[**লেখক পরিচিতি ঃ** 'পথের পাচালী' এবং 'অপরাজিত' উপন্যাসের স্রষ্টা বিভূতিভূষণ এ যুগের শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিকদের অন্যতম। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে ব্যারাকপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচনার শ্রেষ্ঠ উপাদান প্রাকৃতিক বর্ণনা। 'অপরাজিত' এবং 'পথের পাচালী' ছাড়াও তিনি অনেক উপন্যাস লিখেছেন। এগুলির মধ্যে 'দেবযান', 'আরণ্যক', 'ইছামতী', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'দৃষ্টিপ্রদীপ' এবং ছোটদের জন্য 'চাঁদের পাহাড়' এবং 'বিচিত্র জগৎ' উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।]

হরিহর রায়ের আদি বাসস্থান যশোর। বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ধনী বংশ চৌধুরীরা নিষ্কর ভূমিদান করিয়া যে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণকে সেকালে গ্রামে বাস করাইয়াছিলেন, হরিহরের পূর্ব্বপুরুষ বিষ্ণুরাম রায় তাঁহাদের মধ্যে একজন।

বৃটিশ শাসন তখনও দেশে বদ্ধমূল হয় নাই। যাতায়াতের পথ সকল ঘোর বিপদসঙ্কুল। ডাকাতের দল প্রায়ই গোয়ালা, বাগদী, বাউরী শ্রেণীর লোক। তাহারা অত্যন্ত বলবান—লাঠি এবং সড়কী চালাতেই সুনিপুণ ছিল। বহু গ্রামের নিভৃত প্রান্তে ইহাদের স্থাপিত 'ডাকাতে' কালীর মন্দিরের চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। দিনমানে ইহারা ভাল মানুষ সাজিয়া বেড়াইত; রাত্রে কালীপূজা দিয়া দূর পল্লীতে গৃহস্থবাড়ী লুঠ করিতে বাহির হইত।

তখনকার কালে অনেক সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থও ডাকাতি করিয়া অর্থসঞ্চয় করিতেন। বাংলাদেশে বহু জমিদার ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের অর্থের মূল ভিত্তি যে এই পূর্ব্বপুরুষসঞ্চিত লুণ্ঠিত ধনরত্ন, যাঁহারাই প্রাচীন বাংলার কথা জানেন—তাঁহারাই ইহা জানেন।

বিষ্ণুরাম রায়ের পুত্র বীরু রায়ের এরূপ অখ্যাতি ছিল। তাঁহার অধীনে বহু বেতনভোগী ঠ্যাঙাড়ে থাকত।

নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের উত্তরে যে কাঁচা সড়ক ওদিকে চুয়াডাঙ্গা হইতে আসিয়া নবাবগঞ্জ হইয়া টাকী চলিয়া গিয়াছে, ওই সড়কের ধারে দিগন্তবিস্তৃত বিশাল সোনাডাঙার মাঠের মধ্যে ঠাকুরঝি পুকুর নামক সেকালকার এক বড় পুকুরের ধারে ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডা ছিল। পুকুরধারে প্রকাণ্ড বটগাছের তলে তাহারা লুকাইয়া থাকিত এবং নিরীহ পথিককে মারিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। ঠ্যাঙাড়েদের কার্য্যপ্রণালী ছিল অদ্ভুত ধরনের। পথচলতি লোকের মাথায় লাঠির আঘাত করিয়া আগেই তাহাকে মারিয়া তবে তাহার কাছে অর্থান্বেষণ করিত—মারিয়া ফেলিবার পর এরূর ঘটনাও বিচিত্র ছিল না যে দেখা গেল নিহত ব্যক্তির কাছে সিকি-পয়সাও নাই। লাস পুকুরের মধ্যে গুঁজিয়া রাখিয়া ঠ্যাঙাড়েরা পরবর্তি শিকারের উপর দিয়া এই বৃথা শ্রমটুকু পোষাইয়া লইবার আশায় নিরীহ মুখে পুকুরপাড়ের গাছতলায় ফিরিয়া যাইত। গ্রামের উত্তরে এই বিশাল মাঠের মধ্যে সেই বটগাছ আজও আছে ও সড়কের ধারে একটা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিকে আজও ঠাকুরঝি পুকুর বলে। পুকুরের বিশেষ চিহ্ন নাই, চৌদ্দ আনা ভরাট হইয়া গিয়াছে—ধান আবাদ করিবার সময় চাষীদের সেই নাবাল জমিটুকু হইতে আজও মাঝে মাঝে নরমুণ্ড উঠিয়া থাকে।

শোনা যায় পূর্ব্বদেশীয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বালকপুত্রকে সঙ্গে করিয়া কালীগঞ্জ অঞ্চল হইতে টাকী শ্রীপুরের ওদিকে নিজের দেশে ফিরিতেছিলেন। সময়টা কার্তিক মাসের শেষ, কন্যার বিবাহের অর্থসংগ্রহের জন্য ব্রাহ্মণ বিদেশে বাহির হইয়াছিলেন, সঙ্গে কিছু অর্থ ও জিনিসপত্র ছিল। হরিদাসপুরের বাজারে চটিতে রন্ধন-আহারাদি করিয়া তাঁহারা দুপুরের কিছু পরে পুনরায় পথে বাহির হইয়া পড়িলেন, ইচ্ছা রহিল যে পাঁচ ক্রোশ দূরের নবাবগঞ্জ

বাজারের চটিতে রাত্রি যাপন করিবেন। পথের বিপদ তাঁহার অবিদিত ছিল না। কিন্তু আন্দাজ করিতে কিরূপ ভুল হইয়াছিল—কার্তিক মাসের ছোট দিন, নবাবগঞ্জের বাজারে পৌঁছিবার অনেক পূর্ব্বে সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে সূর্য্যকে ডুবুডুবু দেখিয়া তাঁহারা দ্রুতপদে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরঝি পুকুরের ধারে আসিতেই তাঁহারা ঠ্যাঙাড়ের হাতে পড়েন।

দস্যুরা প্রথমে ব্রাহ্মণের মাথায় এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিতেই তিনি প্রাণভয়ে চিৎকার করিতে করিতে পথ ছাড়িয়া মাঠের দিকে চলিলেন—ছেলেও বাবার পিছুপিছু ছুটিল।

কিন্তু একজন বৃদ্ধ, অপরজন বালক—ঠ্যাঙাড়েদের সঙ্গে কতক্ষণ দৌড়ে পাল্লা দিবে? অল্পক্ষণেই তাহারা আসিয়া শিকারের নাগাল ধরিয়া ঘেরাও করিয়া ফেলিল। নিরুপায় ব্রাহ্মণ নাকি প্রস্তাব করেন যে তাঁহাকে মারা হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্রের জীবন দান—বংশের একমাত্র পুত্র, পিণ্ড-লোপ ইত্যাদি। বীরু রায়ও নাকি সেদিন দলের মধ্যে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিতে পারিয়া প্রাণভয়ার্ত্ত বৃদ্ধ তাঁহার হাতে পায়ে পড়িয়া অন্ততঃ পুত্রটির প্রাণরক্ষার জন্য বহু কাকুতি-মিনতি করেন—কিন্তু সরল ব্রাহ্মণ বুঝেন নাই—তাঁহার বংশের পিণ্ডলোপের আশঙ্কায় অপরের মাথাব্যথা হইবার কথা নহে, বরঞ্চ তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে ঠ্যাঙাড়েদের অনুরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। সন্ধার অন্ধকারে হতভাগ্য পিতা-পুত্রের মৃতদেহ একসঙ্গে ঠাণ্ডা হেমন্তরাতে ঠাকুরঝি পুকুরের জলে—শ্যামাঘাসের দামের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়া বিরু রায় বাটী চলিয়া গেলেন।

এই ঘটানার পরে বেশীদিন নয়—ঠিক পর বৎসর পূজার সময়। বীরু রায় সপরিবারে নৌকাযোগে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী হলুদবেড়ে হইতে ফিরিতেছিলেন। নকীপুরের নীচের বড় নোনাগাঙ পার হইয়া মধুমতীতে পড়িবার পর তুই দিনের জোয়ার বহিয়া তবে

আসিয়া দক্ষিণ শ্রীপুরের কাছে ইছামতীকে পড়িতে হইবে। সেখান হইতে আর দিন চারেকের পথ আসিলেই স্বগ্রাম।

সারাদিন বাহিয়া আসিয়া অপরাহ্ণে টাকীর ঘাটে নৌকা লাগিল। বাড়ীতে পূজা হইত। টাকীর বাজার হইতে পূজার দ্রব্যাদি কিনিয়া রাত্রিতে সেখানে অবস্থান করিবার পর প্রত্যুষে নৌকা ছাড়িয়া সকলে দেশের দিকে রওনা হইলেন। দিন তুই পরে ইছামতির মোহনায় ধলচিতের বড় খালে একটা নির্জন চরে জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা লাগাইয়া রন্ধনের যোগাড় হইতে লাগিল। বড় চর মাঝে কাশঝোপ ছাড়া অন্য গাছপালা নাই, এক স্থানে মাঝিরা ও অন্যস্থানে বীরু রায়ের স্ত্রী রন্ধন চড়াইয়াছিলেন। সকলেরই মন প্রফুল্ল। তুইদিন পরেই দেশে পৌঁছানো যাইবে বিশেষতঃ পূজা নিকটে—সে আনন্দ ত আছেই।

জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। নোনা গাঙের জল চক্ চক্ করিতেছিল। হাওয়ায় চরের কাশফুলের রাশি, আকাশের জ্যোৎস্না, মোহানার জল একাকার করিয়া উঠিতেছিল। হঠাৎ কিসের শব্দ শুনিয়া তু-এক জন মাঝি রন্ধন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কাশঝোপের আড়ালে যেন একটা হুটপাট শব্দ, একটা ভয়ার্ত্ত কণ্ঠ একবার অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিয়া যেন তখনি থামিয়া গেল! কৌতূহলী মাঝিরা ব্যাপার কি দেখিবার জন্য কাশঝোপের আড়ালটা পার হইতে না হইতেই কি যেন একটা হুড়ুম করিয়া চর হইতে জলে গিয়া ডুব দিল। চরের সে দিকটা জনহীন—কিছুটা কাহারও চোখে পড়ল না।

কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, কি হইল, বুঝিবার পূর্ব্বে বাকি দাঁড়ি মাঝি সেখানে অসিয়া পৌঁছিল। গোলমাল শুনিয়া বীরু রায় আসিলেন' তাঁহার চাকর আসিল। বীরু রায়ের একমাত্র পুত্র নৌকাতে ছিল, সে কই? জানা গেল রন্ধনের বিলম্ব দেখিয়া সে খানিক আগে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। দাঁড়ি মাঝিদের মুখ শুকাইয়া গেল—

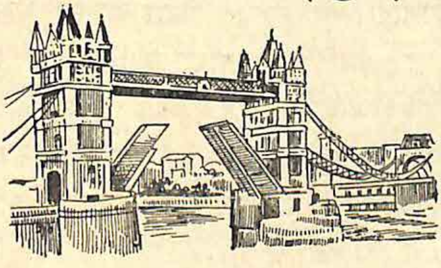
এদেশের নোনা গাঙসমূহের অভিজ্ঞতায় তাহারা বুঝিতে পারিল কাশবনের আড়ালে বালির চরে বৃহৎ কুমীর শুইয়া ওৎ পাতিয়া ছিল—ডাঙ্গা হইতে বীরু রায়ের পুত্রকে লইয়া গিয়াছে।

তাহার পর অবশ্য যাহা হয় হইল। নৌকার লগি লইয়া এদিক ওদিক খোঁজাখুজি করা হল। নৌকা ছাড়িয়া মাঝনদীতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সকলে সন্ধান করিয়া বেড়াইল—তাহার পর কান্নাকাটি, হাত পা ছোঁড়াছুড়ি।

গত বৎসর দেশের ঠাকুরঝি-পুকুরের মাঠে প্রায় এই সময়ে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল—যেন অদৃশ্য বিচারক এ বৎসর ইছামতীর নির্জন চরে তাহার বিচার নিষ্পন্ন করিলেন। মূর্খ বীরু রায় ঠেকিয়া শিখিলেন যে অদৃশ্য ধর্ম্মাধিকরণের দণ্ডকে ঠাকুরঝি পুকুরের শ্যামাঘাসের দামে প্রতারিত করিতে পারে না, অন্ধকারেও তাহা আপন পথ চিনিয়া লয়। বাড়ী আসিয়া বীরু রায় আর বেশীদিন বাঁচেন নাই।

Every man has to accept the fruit of be activity — good or bad. Justice of Providence reigns supreme.

লণ্ডন শহর



অন্নদাশংকর রায়

[**লেখক পরিচিতি ঃ** ১৯০৪ সালে অন্নদাশংকরের জন্ম হয়। একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক এবং প্রবন্ধ-রচয়িতা। দীর্ঘকাল সরকারী চাকরীতে বৃত ছিলেন। 'পথে প্রবাসে', 'উড়কি ধানের মুড়কি', 'রাঙা ধানের খৈ', 'জীবন-

শিল্পী' প্রভৃতি এঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ মর্যাদার অধিকারী এই সাহিত্যিক এখনও জীবিত আছেন।]

লণ্ডন টেম্‌স্ নদীর কূলে। কিন্তু গঙ্গা, গোদাবরী দেশের লোক আমি টেম্‌সকে নদী বলি কেমন করে। লণ্ডনের যে কোনো চওড়া রাস্তাকে পাশাপাশি করলে টেম্‌সের চেয়ে এক এক জায়গায় কম অপ্রশস্ত হয় না। ছোট হলে কি হয় নদীটি নৌবাহ্য। বড় বড় জাহাজকে অনায়াসে কোল দেয়। শহরের বাহিরে তার উভয় তটে ছবির মতো বন, তার সবুজ কূল মখমলে মোড়া। কিন্তু শহরের ভিতরকার জল কলকাতার গঙ্গার মতো বিবর্ণ, কাশীর গঙ্গার মত স্বচ্ছ নয়। তার ধারে দাঁড়ালে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে ; বাতাস তো নেই, আছে ধোঁয়া।

লণ্ডন শহর গোটা সাত-আট কল্‌কাতার সমান। আয়তন ছাড়া নতুন কিছু দেখ্‌বার নাই। সেই ট্রাম, সেই বাস, সেই ট্যাক্সি, সেই বস্তি, সেই মাঠ, সেই প্রাসাদ। প্রভেদ এই যে, সমস্তই অতিকায়। লণ্ডনের দীনতর অঞ্চলগুলিও প্রত্যেকটি যেন একটি দক্ষিণ কলকাতা। ঐশ্বর্যে অতটা না হোক পরিচ্ছন্নতায় অতটা। এত বড় শহর, কিন্তু সেই অনুপাতে কোলাহল-মুখর নয়। অবশ্য কলের কর্কশ আওয়াজে বাড়ীর ভিৎ পর্যন্ত নড়ে এবং মোটরের দাপাদাপিতে রাস্তাগুলোর বুক দুড় দুড় করে, কিন্তু জনতার মুখে কথা নেই। ভিড়ের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করিলেও শোনা যায়। ফেরিওয়ালার রকমারি হাঁক নেই, তার চলন্ত বিজ্ঞাপন পড়ে বুঝিতে হয় সে কী বেচিতে চায় ও কম দামে।

লণ্ডনের পথে পথে রথযাত্রার ভিড়, কিন্তু ভিড়ের মধ্যেও শৃঙ্খলা আছে। পুলিশের বন্দোবস্ত অতুলনীয় ; কিন্তু কথা হচ্ছে, পুলিশের নয় জনতার। শৃঙ্খলা মেনে চলা যেন এদের দ্বিতীয় প্রকৃতি। রাস্তায় কিছু একটা ঘটেছে, কৌতূহলীরা দাঁড়িয়ে দেখছে, লাইনের পিছনে লাইন, যে লোকটা সকলের শেষে এসে পৌছল সে লোকটা মাত্র

দুটো কনুয়ের জোরে সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে না ; যে আগে এসেছে সে আগে, যে পরে এসেছে সে তার পিছনে কিংবা পাশে। রেলের টিকিট করতে হবে, ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তি ইতর ভাষায় গালাগালি কোনটাই কোন কাজে লাগবে না ; যে আগে আসবে সে আগে দাঁড়াবে, তার পিছনে তার পরের। একজনের পর একজন টিকিট নেবে ; সিঁড়ি দিয়ে একে একে ট্রেনের কাছে যাবে, ট্রেনের থেকে যাদের নামবার কথা তারা নামলে পরে ট্রেনে যাদের ওঠবার কথা তারা উঠবে এবং জায়গা থাকে তো আগে মেয়েরা বসবে, না থাকে তো যারা আগে থেকে বসে আসছে তারা উঠে মেয়েদের জায়গা দিয়ে নিজেরা দাঁড়াবে। এতটুকু করতে আমাদের দেশে পা মুখ কান সব কটা অঙ্গের কসরত হয়ে যায় বিশেষ করে কানের! এদেশের কিন্তু সমস্ত নিঃশব্দে সারা হয়।

বলেছি লণ্ডন শহরে নতুন কিছু দেখবার নেই, আয়তন সমৃদ্ধ ও সজ্জা ব্যতীত। তবু মোটা গোছের গোটা কয়েক প্রভেদ স্থূল দৃষ্টি এড়ায় না। এই যেমন মাটির নিচে টিউব বা ইলেকট্রিক রেলরাস্তা,—যেন পাতালপুরীর রাজপথ। যাত্রীরা নিচে নামছে, মিনিটে মিনিটে ট্রেন পাচ্ছে, মাইলের পর মাইল যাচ্ছে, ট্রেন থেকে মাটির উপরে উঠে আপিস আদালত করছে। কিংবা উঁচু-নীচু পাহাড়কাটা রাস্তা, দু'ধারে একই আকারের এক-এক সারি বাড়ি, একটা দেখলেই একশোটা দেখা হয়ে যায়। বাড়ির আশে পাশে হয়তো এক টুকরো সবুজ, সবুজের ওপরে এক ঝলক রক্ত বা একমুঠো হরিদ্রা। কিংবা যেমন শহরের স্থানে স্থানে মাঠ, গড়ের মাঠের চেয়ে চওড়া তাদের বুক ; কিন্তু তেমন চিক্কণ নয়, বন্ধুর। মাঠের কোলে কৃত্রিম হ্রদে নরনারী দাঁড় টানে, সাঁতার দেয়, দমদেওয়া পুতুল জলে ভাসায়, হাঁসের সাঁতার দেখে, ছিপ ফেলে মাছের আশায় দিন কাটায়। মাঠের মেঝের ওপরে সবুজ দুর্বার কার্পেট বিছানো।

লণ্ডনের উপবনগুলি নানা জাতের গাছপালায় গহন, গাছেদের

মাথায় সোনালী চুল। দুঃখের কথা এ দেশের ফুলের গন্ধ নেই; গুণ নেই, রূপ আছে; ফুল নয় তো ফুলবাবু। তাই হাওয়া ফুলের গন্ধে বেহোঁস হয় না, রাত ফুলের গন্ধে উতলা হয় না, মানুষের একটি ইন্দ্রিয় বুভুক্ষু থেকে যায়। মাঠ বা পার্কগুলি এদের ন্যাশনাল প্লে-গ্রাউণ্ড। সেখানে ছোট ছেলেরা গাছে ওঠে, ছোট মেয়েরা বল নাচায়, কিশোরেরা ঘুড়ি ওড়ায়, কিশোরীরা বাজি রেখে দৌড়ায়, যুবক-যুবতীরা টেনিস্ খেলে, বৃদ্ধেরা বসে বসে ঝিমায়, বৃদ্ধারা কুকুরের শিকলহাতে ঠুক-ঠুক করে হাঁটে। সেখানে খোকাবাবুরা-খুকুমণিরা ঠেলাগাড়িতে চড়ে দিগ্‌বিজয়ে বাহির হন, মায়েরা ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে চলেন।

মাঠ বা পার্কগুলিতে যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণ বুঝতেই পারা যায় না যে, লণ্ডনের ভিতর আছি। জনসমুদ্রের মাঝখানে এগুলি এক একটি দ্বীপ; দ্বীপের চারধারে ঢেউয়ের উপর ঢেউ ভেঙে পড়েছে, সেখানে অনন্ত কলরোল। কিন্তু দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে তার প্রতিধ্বনি পৌঁছায় না, তার দুঃস্বপ্ন মিলিয়ে আসে, সবুজ আসন পেতে মাটি বলে 'একটু বসো', সোনালী চামর দুলিয়ে গাছেরা বলে, 'একটু জিরিয়ে নাও। কিন্তু লণ্ডনের মানুষকে শান্তির মন্ত্রে বশ মানানো যায় না, দু'দণ্ড সে স্থির হয়ে বসতে চায় না, উদ্ভিদের মতো স্থাবর হতে তার আপত্তি, সে জন্ম-যাযাবর। কাজ আর অকাজ তাকে নানান সুরে ডাকে। তার ব্যস্ততার ইয়ত্তা নেই। যেখানে সে আপিস করতে, শেয়ার কিন্‌তে, টাকা রাখতে যায় সেটার নাম সিটি, প্রায় হাজার দু'য়েক বছর আগে তাকে নিয়ে লণ্ডনের পত্তন হয়। সিটির পশ্চিম দিকে ওয়েস্ট এণ্ড। সে অঞ্চলে লোকে বাজার করতে, আমোদ করতে, আহার করতে যায়; সেখানে বড় বড় দোকান, বড় বড় হোটেল, বড় বড় ক্লাব, বড় বড় থিয়েটার, সিনেমা, নাচঘর, কন্‌সার্ট হল, চিত্রাগার, মিউজিয়ম, প্রদর্শনী। সিটিতে বড় কেউ বাস করে না; ওয়েস্ট এণ্ডে ধনীরা বাস করেন। দরিদ্রের জন্যে ইস্ট এণ্ড আর

মধ্যবিত্তদের জন্যে শহরতলীগুলো। এগুলো মোটের উপর নিরালা স্বাস্থ্যকর ও সুবিন্যস্ত।

রেস্তোরাঁ যে এ শহরে কত লক্ষ আছে তার গণনা চলে না। আহারের জন্যে রেস্তোরাঁ, নিদ্রার জন্যে ফ্ল্যাট্ বা রুম্স্—সাধারণ গৃহস্থের জন্য এই হচ্ছে এখানকার ব্যবস্থা। যাদের সঙ্গতি আছে তারাও বাড়িতে না খেয়ে বাইরে খায় এই জন্যে যে, সারাদিন যেখানে জীবিকার জন্যে খাটতে হয় বাড়ি সেখান থেকে অনেক দূরে, কিংবা বাড়িতে রান্না করতে যেটুকু সময় লাগে সেটুকুর বাজারদর রেস্তোরাঁয় খাবার খরচের চেয়ে বেশি, কিংবা বাড়িতে অল্পসংখ্যক লোকের রান্নায় যত খরচ রেস্তোরাঁয় বহুসংখ্যক লোকের রান্নায় সে অনুপাতে কম। কথা উঠবে তবে বাড়ির মেয়েরা করে কি? তার জবাব এই যে, বাড়ির মেয়েরাও আপিস করে। সকলে নয় অবশ্য, কিন্তু অনেকে। তরুণী মাত্রেই স্কুল-কলেজে যায়, বয়স্কা মাত্রেরই কোনো কাজ আছে। মেয়েরাও ছেলেদের স্কুলে দিয়ে কাজে যায়; তবে কোলের ছেলে হলে তার গাড়ি ঠেলে মাঠে নিয়ে যায়; খোকা যতক্ষণ হাওয়া খায়, অন্তত ফীডিং বট্‌ল চুষে দুধ খায়, খোকার মা ততক্ষণ জামা সেলাই করে। হাতে কোনো একটা কাজ না থাকলে যেন এরা বাঁচতে পারে না, জীবনটা ফাঁকা ঠেকে। চুপ করে বসে থাকা এদের ধাতে সয় না, তাই ছুটি পেলে এরা বড় বিব্রত হয়ে ভাবে ছুটি কেমন করে কাটাবে। ভিক্ষা করা এদেশে আইনবিরুদ্ধ; করলে কঠিন সাজা। তাই ভিক্ষুকেরাও কোনো একটা কাজ করবার ভান করে পয়সা রোজগার করে, হয় দু'পয়সার দেশলাই চার পয়সায় বেঁচে অর্থাৎ বেচবার ভান করে হাত পাতে, নয় ফুটপাতের ওপরে ছবি এঁকে পথিকদের সামনে টুপী খোলে, নয় কিছু একটা বাজিয়ে বা গেয়ে দাতাকে খুশি করে, কিন্তু মুখ ফুটে বলে না 'ভিক্ষা দাও', বল্লেই পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। এত কথা এ প্রসঙ্গে বলবার উদ্দেশ্য, এরা কাজ জিনিসটাকে কি চক্ষে দেখে তাই বোঝান। নিষ্ক্রিয়তাকে এদেশে ধর্ম বলে না। (সংক্ষেপিত)

Description of London city and ct[?]s people.



বিদ্যাসাগর

বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)

[**লেখক পরিচিতি :** 'বনফুল' ছদ্মনাম, প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। প্রকৃতপক্ষে এঁর পেশা ছিল ডাক্তারী, সাহিত্যরচনা ছিল নেশা। জীবনের অধিকাংশ সময়ই বিহারের ভাগলপুরে বসবাস করেন, কিছুকাল আগে কলকাতায় এসেছেন। একাধারে ইনি ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, ছোটগল্পকার এবং অঙ্কনশিল্পী। এঁর রচিত 'স্থাবর' ও 'জঙ্গম' উপন্যাস দুটি এঁকে বাংলা সাহিত্যে এক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ছোট গল্পকার হিসেবেও এঁর সমধিক প্রসিদ্ধি রয়েছে।]

[মার্শাল সাহেবের অফিস। সাহেব টেবিলে বসিয়া কাজ করিতেছেন। বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পায়ে চটি, গায়ে সাদা চাদর সাহেব সসম্ভ্রমে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিলেন। সাহেব বাংলা শিখিয়াছেন, শুদ্ধ কেতাবী বাংলা বলেন, ক্রিয়াপদও প্রায় কেতাবী, কখনও চলিত। 'দ' স্থানে 'ড' এবং 'ত' স্থানে 'ট' প্রভৃতি উচ্চারণের দোষও আছে।

মার্শাল। নমস্কার, নমস্কার, আসুন পণ্ডিত !

বিদ্যাসাগর। আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি, তারানাথ তর্কবাচস্পতি মশায় কাজে যোগদান করেছেন। আপনার অনুগ্রহ না হলে এটা হ'ত না।

মার্শাল। আমি কিন্তু আশ্চর্যান্বিত। আপনার মত এরূপ মহত্ত্ব দুর্লভ। আমি স্থির করিয়াছি, আপনাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। রাজি ?

বিদ্যাসাগর। আমি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, আমার অনেক অধ্যাপক সেখানে এখনও শিক্ষকতা করছেন, সেখানে কি আমার—

মার্শাল। না না, এবার আমি কোন কথা শুনিতে চাই না পণ্ডিত। আপনার মত লোককে পুরস্কৃত করিবার সৌভাগ্য হইতে এবার আমাকে বঞ্চিত করিবেন না, এবার আমি নিজের মতে চলিব।

বিদ্যাসাগর। আপনি যদি সত্যই আমাকে পুরস্কৃত করিতে চান, তাহলে—

মার্শাল। [সাগ্রহে] হাঁ হাঁ, কি বলুন, আপনার অভিপ্রায় কি ?

বিদ্যাসাগর। আমার দেশের স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের কাজে যদি আমাকে লাগিয়ে দেন, তাহলে আমি বড় সুখী হই।

মার্শাল। আনন্দের সহিত। আপনি এখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হউন। ক্রমশঃ নূতন স্কীমে যে ইন্‌স্পেক্টারের পদ সৃষ্ট হইবে, তাহাতেও আপনাকে লাগাইয়া দিবার চেষ্টা করিব। মিষ্টার বীটন্ আপনার উপর খুবই সন্তুষ্ট আছেন। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার সহজেই করিতে পারিবেন। নূতন স্কীমে ইন্‌স্পেক্টারেরই নূতন বিদ্যালয় স্থাপনের অধিকার থাকিবে।

বিদ্যাসাগর। তাহলে ত ভালই হয়।

মার্শাল। [সহাস্যে] আপনার নিকট আমি আজ কিন্তু একটি অনুরোধ করিতে ইচ্ছুক।

বিদ্যাসাগর। কি বলুল।

মার্শাল। অনুরোধটি শুনিবার পূর্বে আপনি একটা কথা ভাবিয়া দেখুন, যে সব সিভিলিয়ান ছাত্র আপনার নিকট বাংলা অধ্যয়ন করে, তাহারা আপন আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া কত দূর দেশ হইতে আসে, ভাবিয়া দেখুন।

বিদ্যাসাগর। তা তো জানি।

মার্শাল। আরও ভাবিয়া দেখুন, তাহারা চাকুরি করিবার জন্যই কত কষ্টে সমুদ্র পার হইয়া এই গরম দেশে আসে। আপনি যদি

তাহাদের প্রতি একটু সদয় না হন, বেচারীরা মারা যায়—এই অনুরোধ।

[বিদ্যাসাগর অনুরোধের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইলেন।]

বিদ্যাসাগর। আমি তো যথাসাধ্য চেষ্টা করি তাদের সাহায্য করতে। আমার অধ্যাপনায় কি আপনারা সন্তুষ্ট নন? তা যদি হয়, তাহলে—

মার্শাল। না, না, আপনার অধ্যাপনা খুবই সুন্দর, সব রকমে উৎকৃষ্ট, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে জানি। উহারা আপনার মত শিক্ষক সৌভাগ্যবলে লাভ করিয়াছে। আমি সে কথা বলিতেছি না, আমি আপনাকে কেবল একটু নরম হইতে অনুরোধ করিতেছি।

[বাম চক্ষুটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিলেন।]

বিদ্যাসাগর। নরম! তার মানে?

মার্শাল। আমি নিশ্চয় বলিব, পরীক্ষক হিসাবে আপনি বড় শক্ত। পরীক্ষায় ফেল করিলে কিন্তু বেচারীদের চাকুরিতে—

বিদ্যাসাগর। যে পাস করবার উপযুক্ত নয়, তাকে আমি কি করে পাস করিয়ে দেব?

মার্শাল। উহাদের অবস্থা চিন্তা করিয়া একটু যদি—

[বাম চক্ষুটি আবার কুঞ্চিত করিলেন।]

বিদ্যাসাগর। ওটি আমার দ্বারা হবে না। আপনারা অন্য লোক দেখুন তাহলে।

মার্শাল। [শশব্যস্তে] না, না, না—আপনি অন্য কিছু মনে করিবেন না। ইহা শুধু অনুরোধ মাত্র। আপনি যদি রক্ষা করিতে না পারেন, আমি মোটেই দুঃখিত হইব না।

বিদ্যাসাগর। যার যোগ্যতা নেই, তাকে পাস করানো মানে—বিশ্বাসঘাতকতা করা। তা আমি পারব না।

মার্শাল। বেশ, আপনার অভিরুচি অনুসারে চলুন। আমি এ বিষয়ে আর কিছু বলতে চাই না।

[উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন।]

বিদ্যাসাগর। আমি আপনার কাছে একটি অনুরোধ নিয়ে এসেছি।

মার্শাল। কি বলুন ?

বিদ্যাসাগর। ছুটি চাই। আমার ভাইয়ের বিয়ে, মা বাড়ী যেতে লিখেছেন।

মার্শাল। ছুটি ? কত দিনের ?

বিদ্যাসাগর। অন্ততঃ তিন চার দিনের।

মার্শাল। তাহা তো এখন অসম্ভব, কলেজের কাজকর্ম চলিবে কিরূপে ?

[বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন।]

বিদ্যাসাগর। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। বিয়ে ছাড়া আমার নিজেরও একটু দরকার আছে বাবা-মায়ের কাছে।

মার্শাল। খুব জরুরি ?

বিদ্যাসাগর। হাঁ জরুরি, তাঁদের জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত আমি একটা কাজে হাত দিতে পারছি না।

মার্শাল। (বিস্মিত) আপনি কি এখনও সকল কার্য তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে করেন ?

বিদ্যাসাগর। সকল কার্য করি না। কিন্তু এ কাজটিতে হাত দেবার আগে আমি তাঁদের পরামর্শ নিতে চাই।

মার্শাল। এমন কি কাজ ?

বিদ্যাসাগর। বিধবা-বিবাহ। মা-বাবা যদি আপত্তি না করেন তাহলে এ নিয়ে আন্দোলন করব আমি। বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়

প্রমাণাদি আমি আগেই বাবার কাছে লিখে পাঠিয়েছি। তিনি এখনও উত্তর দেন নি।

মার্শাল। আপনার এ চেষ্টা খুবই প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু ডাকযোগেই তো আপনি তাঁদের উত্তর পেতে পারেন।

বিদ্যাসাগর। আমি এর জন্য ছুটি চাইছি না। আমার ভাইয়ের বিয়ে, সেই জন্যই ছুটি চাই।

মার্শাল। আমি খুবই দুঃখিত, ছুটি দেওয়া এখন চলবে না। কাজের বড়ই ক্ষতি হইবে।

[বাহিরে ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিল। বিদ্যাসাগর উঠিলেন।]

বিদ্যাসাগর। ক্লাসের ঘণ্টা পড়িল। উঠি তাহলে।

মার্শাল। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি খুবই দুঃখিত, পণ্ডিত।

[বিদ্যাসাগর চলিয়া গেলেন, মার্শাল-সাহেব অফিসের কাজকর্ম করিতে লাগিলেন। সহসা বিদ্যাসাগর আবার প্রবেশ করিলেন।]

বিদ্যাসাগর। আমি ভেবে দেখলাম আমাকে যেতেই হবে।

মার্শাল। ছুটি না দিলেও যাবেন ?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, চাকরি ছেড়ে দিয়ে যাব।

মার্শাল। কি মুশকিল, তাহা হইলে তো ছুটি দিতেই হয়। (হাসিয়া) কলেজের কাজ অপেক্ষা বিবাহের নিমন্ত্রণটাই আপনার নিকট বড় হইল ?

বিদ্যাসাগর। নিমন্ত্রণ বড় নয়, মা ডেকেছেন সেইটেই বড়। যে সন্তান মায়ের আদেশ পালন না করতে পারে, সে নরাধম।

[চলিয়া গেলেন]

Some Salient features of Vidyasagar's Character.



নিউটনের কীর্তি

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

[**লেখক পরিচিতি ঃ** ১৮৬৪ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দি মহকুমায় জন্ম। রিপন কলেজের (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। সরস এবং সহজ ভাষায় জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি রচনায় এঁর জুড়ি মেলা ভার। অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে 'জিজ্ঞাসা', 'চরিতকথা' প্রভৃতি গ্রন্থ বিখ্যাত। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।]

নিউটনের নাম তোমরা শুনিয়া থাকিবে। তাঁহার মত জ্ঞানী লোক পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। পুরাতন হইলেও নিউটনের সম্বন্ধে একটি কথা আজ বলিব।

প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে ইংলণ্ড দেশে নিউটন জন্মিয়াছিলেন। তিনি যে বৎসর জন্মিয়াছিলেন সেই বৎসর গ্যালিলিওর মৃত্যু হয়। গ্যালিলিও ইটালিদেশবাসী ছিলেন। গ্যালিলিওর নাম পণ্ডিত-সমাজে বিখ্যাত। গ্যালিলিও "পেণ্ডুলমযুক্ত" ঘড়ি বাহির করেন। গ্যালিলিও আরও অনেক বড় বড় কাজ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি সে কথা বলিবার দরকার নাই। গ্যালিলিও খুব বড় লোক ছিলেন, কিন্তু নিউটন তাঁহা অপেক্ষাও বড় লোক।

নিউটনের প্রধান কাজ তোমরা হয়ত শুনিয়া থাকবে, নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই রকম একটা গল্প আছে যে, নিউটন একদিন এক বাগানে বসিয়া ভাবিতেছিলেন। এমন সময় গাছ হইতে একটা আপেল ফল নিচে

পড়িল। অমনি নিউটন স্থির করিলেন, পৃথিবীর এমন একটা ক্ষমতা আছে, যাহার দ্বারা সে অন্য বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে বা টানিয়া লয়। সেই ক্ষমতার নাম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। পৃথিবীর সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে, তাহাতেই পৃথিবী অন্যান্য দ্রব্যকে আপনার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে।

এই গল্প হয়ত তোমরা শুনিয়া থাকিবে। কিন্তু এই গল্প নিউটনের খ্যাতি না বাড়াইয়া বরং কমাইয়া দেয়। বস্তুত নিউটন ঐরূপ একটা কাজ কিছু করেন নাই।

প্রথমতঃ অনেকে সন্দেহ করেন গল্পটা হয়তো আদৌ সত্য নহে। আপেল পড়ার গল্প সত্য হউক বা না হউক তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। আপেল নীচের দিকে কিরূপে পড়ে, এই তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে নিউটনের বহু বৎসর ধরিয়া চিন্তা করিতে হইয়াছিল। একদিনে অকস্মাৎ নিউটন তাহা বুঝিতে পারেন নাই; এবং বহু বৎসর তিনি এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া মনুষ্যজাতিকে যাহা শিখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অতি অদ্ভুত ব্যাপার। তোমাদিগকে এখন তাহা বুঝাইয়া দিতে পারিব না। আশা করি কালক্রমে তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে।

তথাপি স্থূল কথাটা জানা ভাল। তোমাদের যদি এরূপ বিশ্বাস থাকে যে, পৃথিবীর ভিতরে মাধ্যাকর্ষণ নামে একটা শক্তি আছে তাহারই বলে পৃথিবী অন্য পদার্থকে টানে, আর অন্য পদার্থে সে শক্তি নাই, তাই তাহারা পৃথিবীকে টানিতে পারে না, তাহা হইলে তোমাদের সে বিশ্বাস ভুল। বস্তুত নিউটন সেইরূপ কিছু আবিষ্কার করেন নাই। যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে পৃথিবী কোন পদার্থকে স্বয়ং আকর্ষণ করিতে পারে, নিউটন তাহা নিজেই বিশ্বাস করিতেন না।

তবে নিউটনের কাজটা কি? একটা ফল হাত হইতে ফেলিলে উপরে না যাইয়া নিম্নে পৃথিবীর দিকে চলে। ইহা তোমরাও জান,

নিউটনও জানিতেন, তাহার পূর্বেও লোকে জানিত। পৃথিবী ফলকে আকর্ষণ করে বলিলে সেই কথাটা ঘুরাইয়া বলা হইল। নূতন কথা কিছুই হইল না। নিউটন এমন নির্বোধের মত লোক ছিলেন না যে, একটা কথাকে ঘুরাইয়া বলিয়া বাহাদুরী লইবেন।

তবে নিউটনের বাহাদুরী কিসে? অন্য লোকে দেখে ফলটা পৃথিবীর দিকে যাইতেছে, নিউটন প্রথমে দেখিয়াছিলেন, যে ফল যেমন পৃথিবীর দিকে যায়, পৃথিবীও ঠিক তেমনি ফলের দিকে যায়। অন্য লোকে দেখে, পৃথিবী ফলকে টানে বা আকর্ষণ করে; নিউটন দেখিয়াছিলেন, ফলটিও পৃথিবীটাকে টানে বা আকর্ষণ করে। শুধু তাহাই নহে, প্রকাণ্ড পৃথিবী ক্ষুদ্র ফলটিকে যে বলে টানে, ক্ষুদ্র ফলটিও প্রকাণ্ড পৃথিবীকে ঠিক সেই বলে টানে। উভয়ের প্রতি টান উভয়েরই সমান।

তোমরা হয়ত জিজ্ঞাসা করিবে, সে আবার কি? তবে পৃথিবী ফলের কাছে যায় না কেন; ফলই বা পৃথিবীর দিকে যায় কেন?

উত্তর এই,—পৃথিবী খুব বড়, তাই ফল তাহাকে টানিয়াও অধিকদূর কাছে আনিতে পারে না। আর ফল খুব ছোট, তাই পৃথিবীর সমান বলে টানিয়া তাহাকে আপনার দিকে আনে।

আর একটা কথা নিউটন প্রমাণ করেন। যে কারণে আম, জাম, নারিকেল পৃথিবীর দিকে যায়, সেই কারণে দূরস্থিত চন্দ্রও পৃথিবীর দিকে চলে। চন্দ্র আমাদের পৃথিবী হইতে অনেক দূরে আছে, লক্ষ ক্রোশেরও কিছু অধিক দূরে আছে। কিন্তু সেখানে থাকিয়াও চন্দ্রের অব্যাহতি নাই। গাছের নারিকেলটা যেমন পৃথিবীতে পড়িতে চেষ্টা করিতেছে, চন্দ্রও ঠিক সেইরূপ পৃথিবীতে পড়িতে যাইতেছে। প্রভেদ এই, নারিকেলটা যতক্ষণ গাছ হইতে না খসে, ততক্ষণ উহার বোঁটা শক্তভাবে উহাকে ধরিয়া থাকে, ততক্ষণ উহা পড়িতে পারে না, আর বোঁটাটি ছিঁড়িয়া গেলেই পড়িয়া যায়। চন্দ্রকে কেহ ধরিয়া বা আটকাইয়া নাই, তাই চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে।

তোমরা হয়ত আশ্চর্য হইবে। বলিবে, কৈ চন্দ্র ত কতদিন আমাদের মাথার উপর উঠে, ফলের মত যদি চন্দ্রের পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে এতদিন আমাদের মাথা ভাঙ্গিয়া যাইত। চন্দ্র পড়ে কৈ ?

কিন্তু আশ্চর্য হইও না। চন্দ্র বস্তুতঃ ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে। যে দিন চন্দ্রের সৃষ্টি, সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে এবং চিরকালই পড়িতে থাকিবে। অথচ তোমাদের মাথা ভাঙ্গিবার কোন আশঙ্কা থাকিবে না।

একটা ঢেলা হাত হইতে ফেলিলে হাতের ঠিক নিচে পড়ে। বেগে সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিলে একটু দূরে পড়ে। আরও বেগে ছুঁড়িলে আরও অধিক দূর চলিয়া তাহার পর ভূমিতে পড়ে। আমি এই পশ্চিম মুখে দাঁড়াইয়া এই জিনিষটা বেগে ফেলিলে ত্রিশ-চল্লিশ হাত দূরে গিয়া ভূমি স্পর্শ করিবে। আরও বেগে দিলে হয়ত দু'শ-তিনশ কি দু'হাজার তিন হাজার হাত দূরে গিয়া ভূমি স্পর্শ করিবে। অধিক বেগে দিতে পারিলে হয়ত গঙ্গা পার হইয়া হাবড়াতে না হয় গুজরাটে, না হয় মক্কায় গিয়া পড়িত। আমরা সেইরূপ দিতে পারি না, তাই অতদূর যায় না। অধিক বেগে দিবার উপায় থাকিলে আমরা উহাকে মক্কা কেন, আফ্রিকা পার করিয়া আট্‌লান্টিক সাগরে ফেলিতে পারিতাম। যত দূর যাউক পৃথিবীতে উহাকে পরিতেই হইত। তবে আরও অধিক বেগে পৃথিবীতে না পড়িয়া একবার পৃথিবীটা ঘুরিয়া আবার কলিকাতায় আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত। তবে একেবারে পৃথিবীর কাছ-ছাড়া হইতে পারিত না।

মনে কর, চন্দ্রকে যেন কেহ প্রভূত বেগে পূর্বমুখে ছুঁড়িয়া দিয়াছে, তাই পূর্বমুখে চলিতে চলিতে সাতাইশ দিনে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আবার স্বস্থানে ঘুরিয়া আসে ও আবার চলিতে থাকে। পৃথিবীকে একেবারে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। চন্দ্রের যদি এই

পূর্বমুখে বেগটুকু না থাকিত, তাহা হইলে চন্দ্র একদিন বৃক্ষচ্যুত নারিকেলের ন্যায় পৃথিবীতে আসিয়া আঘাত করিত। তবে নারিকেল ফলটা মাটিতে পড়িলে আমাদের কিছু লাভ হয়। আর চন্দ্রের মত প্রকাণ্ড পদার্থটা মাটিতে পড়িলে আমরা কি, আমাদের পৃথিবীটাই হয়ত ভাঙ্গিয়া যাইত।

একগাছি লম্বা সূতার এক প্রান্তে একটা ঢিল বাঁধ ও আর এক প্রান্ত বাম হাতে ধরিয়া ঝুলাইয়া দাও। তারপর ডান হাতে হু'টি আঙ্গুলে করিয়া ঢিলাটিকে স্বস্থান হইতে খানিকটা সরাও; সুতা-গাছটি যেন বরাবর টানের উপর থাকে। আঙ্গুল ছাড়িয়া দিলে দেখিবে ঢিলটি আবার স্বস্থানমুখে চলিল। যেন সেই স্বস্থানের দিকে তাহার একটা টান আছে। যেখানে ধর না কেন, ছাড়িয়া দিলে আবার সেই স্থানেই যাইবে; কিন্তু একবার ঐরূপে সরাইয়া একটু পাশ দিয়া বেগে ছুঁড়িয়া দাও। এবার দেখ আর স্বস্থানে যাইতে পারিবে না; তবে স্বস্থানের মধ্যবর্তী করিয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। চন্দ্রের অবস্থাও কতকটা সেরূপ রজ্জুবদ্ধ ঢিলের মত। পৃথিবী যেন তাহার স্বস্থান। চন্দ্র সেই পৃথিবীর দিকে যাইতে চাহে; তবে কে কবে তাহার পাশ দিয়া পূর্বমুখে ছুঁড়িয়া দিয়াছে, তাই স্বস্থানে, পৃথিবীর যাইতে না পারিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

নিউটনই প্রমাণ করেন, পৃথিবী যেমন নারিকেলটিকে আপনার কাছে আনিবার চেষ্টা করিতেছে, চন্দ্রকে ঠিক সেইরূপে সেই নিয়মে আপনার নিকটে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। কলুর বলদ যেমন ঘানিগাছের চারিদিকে বাধা হইয়া ঘুরে, ইচ্ছা করিলেও অন্য পথে যাইতে পারে না, চন্দ্রও সেইরূপ পৃথিবীতে বাধা থাকিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। তাহার অন্য পথে যাইবার জো নাই। তবে বলদ ঘানিগাছে দড়াদড়ি দিয়া বাঁধা থাকে, তাই ঘানিগাছের দিকে তাহার টান। আর চন্দ্র পৃথিবীর দিকে সেইরূপ আমাদের দৃষ্টির

অগোচরে কোন দড়াদড়ি দিয়া বাঁধা আছে কিনা তাহা আমরা জানি না। নিউটনও তাহার সম্বন্ধে আমাদিগকে কিছুই বলিয়া যান নাই।

শুধু চন্দ্র কেন, স্বয়ং পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। শুধু পৃথিবী কেন, বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি আরও কতকগুলি পদার্থ কোনটা বা পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড় কলুর বলদের মত সূর্য্যের চারদিকে ঘুরিতেছে। ঘুরিতেছে সত্য, সূর্য্যে যেন বাঁধা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু কিরূপ দড়িতে বাঁধা আছে তাহা আমরা জানি না। হয়ত ভবিষ্যতে আর একজন নিউটন জন্মিয়া সেই দড়ি আমাদিগকে দেখাইয়া দিবেন।

নিউটন আমাদিগকে এইটুকু চিনাইয়াছেন যে আম, নারিকেল যে নিয়মে ও যেরূপে পৃথিবীতে পড়ে চন্দ্রও ঠিক সেই নিয়মে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে, পৃথিব্যাদি পদার্থও ঠিক সেই নিয়মে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে। অর্থাৎ এই যে একটা প্রকাণ্ড জগৎ, সূর্য্য যাহার মধ্যস্থল, সাড়ে চারি কোটি ক্রোশ দূরস্থিত পৃথিবী যে জগতের একটি সামান্য পদার্থ মাত্র, সেই জগতে সর্বত্র একই নিয়মে এ উহার দিকে চলিতেছে, ও ইহার দিকে চলিতেছে, এ ইহাকে ঘুরাইতেছে, ও উহাকে ঘুরাইতেছে।

স্থূলভাবে সহজ কথায় নিউটনের এই নীতিকথা তোমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ইহাতে তোমরা মনে করিও না যে, এই ব্যাখ্যায় তোমরা নিউটনের ক্ষমতার সহস্রাংশেরও পরিচয় পাইলে। যদি এই ব্যাখ্যা শুনিয়া নিউটন কত বড় লোক ছিলেন তাহা জানিবার জন্য তোমাদের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলেই এই প্রস্তাবের পাঠ সফল হইবে।

Law of gravitation has been explained in a simple way



শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী বিবেকানন্দ

[**লেখক পরিচিতি ঃ** ১৮৬৩ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শিষত্ব গ্রহণের পর তাঁর নতুন নাম হয় 'স্বামী বিবেকানন্দ'। ১৮৯৩ সালে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে তিনি আমেরিকার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় যোগদান করেন এবং জগৎবাসীর সামনে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিশন্ন করেন। অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলির মধ্যে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। গভীর দেশাত্মবোধ তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ১৯০২ সালে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন।]

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম কোটি কোটি লোকপূর্ণ ভারতের সর্বত্র পরিচিত। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার শক্তি ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশে সুদূর পল্লীগ্রামে জন্মিয়া এই অশিক্ষিত বালক কেবল নিজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অন্তঃশক্তি বলে সত্য উপলব্ধি করিয়া অপরকে প্রদান করিয়া গেল।

ভারতের চারিদিকে যখন নানাবিধ সংস্কার-চেষ্টা হইতেছিল সেই সময় ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গদেশের কোন সুদূর গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ব্রাহ্মণকূলে একটি বালকের জন্ম হয়। তাঁহার পিতামাতা অতি নিষ্ঠাবান সেকেলে ধরনের লোক ছিলেন, তাঁহারা খুব দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু অনেক সময় কোন দরিদ্র অতিথিকে

খাওয়াইতে গিয়া গৃহিনী সারাদিন উপবাস করিয়া থাকিতেন। এইরূপ পিতামাতা হইতে এই শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন। অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং তিনি পাঠশালায় প্রেরিত হন।

অল্পদিন পরে তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল যে সমুদয় লৌকিক বিদ্যার উদ্দেশ্য কেবল সাংসারিক উন্নতি। সুতরাং তিনি লেখাপড়া ছাড়িয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণে সম্পূর্ণরূপে জীবন সমর্পণ করিতে সংকল্প করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সংসারে প্রবল দারিদ্র্য আসিল, এই বালককে নিজের আহারের সংস্থানের চেষ্টা করিতে হইল, তিনি কলিকাতার সন্নিকটে একটি স্থানে যাইয়া তথাকার মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হইলেন। মন্দিরে আনন্দময়ী মাতার একটি মূর্ত্তি ছিল। এই বালককে প্রত্যহ প্রাতে ও সায়াহ্নে তাঁহার পূজা নির্বাহ করিতে হইত। এইরূপ করিতে করিতে এই এক ভাব আসিয়া তাঁহার মনকে অধিকার করিল—"এই মূর্ত্তির ভিতর কিছু বস্তু আছে কি? ইহা কি সত্য, এই জগতে আনন্দময়ী মা আছেন, এসব স্বপ্নতুল্য মিথ্যা"—বালকের হৃদয়ে এই ধারণা প্রবেশ করিলে, তাঁহার সারাদিন কেবল এই ভাবনা—কিসে প্রত্যক্ষ দর্শন হইবে।

তাঁহার জীবনের এই ভাব সম্বন্ধে তিনি অনেকবার বলিয়াছেন, 'কখন সূর্য উদয় হইল, কখন বা অস্ত গেল, তাহা আমি জানিতে পারিতাম না।' মনুষ্য-হৃদয়ে এইরূপ ব্যাকুলতা আসিয়া থাকে। দিবাবসানে সন্ধ্যাকালে যখন মন্দিরের আরতি-শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইতেন, তাঁহার মন তখন অতিশয় ব্যাকুল হইত। এইরূপে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস সত্যলাভের জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টায় কাটিল। তখন তিনি নানাধিব অলৌকিক দৃশ্য, অদ্ভুত রূপ দেখিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার নিজ স্বরূপের রহস্য তাঁহার নিকট ক্রমশঃ উদ্‌ঘাটিত হইতে লাগিল। যেন আবরণের পর আবরণ অপসারিত হইতে লাগিল।

সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই অপূর্ব মানুষকে দেখিতে তাঁহার সরল

গ্রাম্য ভাষায় উপদেশ শুনিতে আসিতে লাগিল। তিনি যাহা বলিতেন, তাহার প্রত্যেক কথাতেই একটি শক্তি মাখানো থাকিত, প্রত্যেক কথাই হৃদয়ের তমোরাশি দূর করিয়া দিত।

তাঁহার জীবনে আদৌ বিশ্রাম ছিল না, তাঁহার জীবনের প্রথমাংশ ধর্ম উপার্জনে ও শেষাংশ উহার বিতরণে ব্যয়িত হইয়াছিল। তাঁহার মানবজাতির প্রতি এইরূপ অগাধ প্রেম ছিল যে, যাহারা তাঁহার কৃপালাভার্থ আসিত, এরূপ সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে অতি সামান্য ব্যক্তিও তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হইত না। মাসের পর মাস এরূপ হইতে লাগিল—অবশেষে এরূপ কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। ক্রমে তাহার গলায় একটি ঘা হইল, তথাপি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াও কথা বন্ধ করা গেল না।

একদিন তিনি আমাদিগকে সেইদিন দেহত্যাগ করিবেন, ইঙ্গিতে জানাইলেন এবং বেদের পবিত্রতম মন্ত্র 'ওঁ' উচ্চারণ করিতে করিতে মহাসমাধিস্থ হইলেন। এইরূপে সেই মহাপুরুষ আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

এইরূপ ব্যক্তির এক্ষণে প্রয়োজন—এই যুগে এইরূপ লোকের আবশ্যক। কোন দেশে এইরূপ ব্যক্তির যতই অভ্যুদয় হইবে, ততই সেই দেশ উন্নত হইবে। আর যে দেশে এইরূপ লোক একেবারে নাই সে দেশের পতন অনিবার্য্য, কিছুতেই উহার উদ্ধারের আশা নাই। ত্যাগ ও প্রত্যক্ষানুভূতির সময় আসিয়াছে। অতএব জগতের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে সামাঞ্জস্য আছে যখন তাহা দেখিতে পাইবে, —বুঝিবে, বিবাদের কোন প্রয়োজন নাই, আর তখনই সমগ্র মানবজাতির সেবা করিতে প্রস্তুত হইতে পারিবে। মদীয় আচার্যদেবের জীবনের ইহাই উদ্দেশ্য ছিল, সকল ধর্মের মধ্যে যে মূলে ঐক্য রহিয়াছে তাহা ঘোষণা করা।

Shri Ramakrishna in the eyes of Swami Vivekananda.



নেতাজী সুভাষচন্দ্র

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

[**লেখক পরিচিতি ঃ** সুসাহিত্যিক এবং সুলেখক ।]

ইংরেজ স্বেচ্ছায় ভারত ছেড়ে যায়নি। এর মূলে ছিল প্রধানতঃ দুটি কারণ ঃ এটি হলো ভারতের নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহ যার সূচনার মূলে ছিলেন একজন বাঙালী। নাম পি. সি. দত্ত। ইনি ছিলেন "তলোয়ার" জাহাজের টেলিগ্রাফিষ্ট। এঁর অপরাধ—জাহাজের দেওয়ালে ইনি লিখেছিলেন—"জয় হিন্দ" আর "ভারত-ছাড়"। অ্যাডমিরাল গডফ্রে সাহেব এঁকে বরখাস্ত করেন। ফলে ধর্মঘট, শেষ পর্যন্ত নৌ-বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়। অপর কারণটি—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সিঙ্গাপুরে দেশগৌরব সুভাষের নেতৃত্বে গঠিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর কর্মতৎপরতা—"দিল্লী চলো" অভিযান।···

ইংরেজি ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী পিতার কর্মস্থল কটক শহরে সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয়। এঁদের আদি বাসস্থান ২৪ পরগণা জেলার কোদালিয়া গ্রামে। সুভাষের পিতা জানকীনাথ বসু কটকের সরকারী উকিল ছিলেন। প্রভূত যশ এবং অর্থ তিনি জীবনে লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রতিটি সন্তানই ছিলেন কৃতি পুরুষ।

কিশোর বয়সেই সুভাষের মনে দেশপ্রেমের ছোঁয়া লেগেছিল। তাছাড়া আবার তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত। ফলে সুভাষের পরবর্তী জীবন গড়ে উঠেছিল দুটি ধারায় —একটি তাঁর আধ্যাত্মিক দিক এবং অপরটি রাজনৈতিক দিক। তাই দেখা যায়, প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী মেধাবী ছাত্র সুভাষ প্রেসিডেন্সী কলেজে আই. এ. পড়ার সময়ে হঠা

সদ্‌গুরুর সন্ধানে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এ সময় তাঁর মধ্যে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিল। কিন্তু সদ্‌গুরু তাঁর মেলেনি। তাই আবার হতাশ হয়ে পড়াশুনায় মন দেন। সসম্মানে আই. এ. পাস করার পর বি. এ. পড়তে থাকেন।

সেই সময়কার একদিনের ঘটনা। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ওটেন সাহেব ছিলেন অত্যন্ত দাম্ভিক ও ভারত-বিদ্বেষী। তাঁর কথাবার্তায় আচার-আচরণে এই ভাবটা সব সময়ে প্রকট হয়ে উঠতো। ক্রমে ক্রমে একদিন তা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং সুভাষচন্দ্র উদ্ধত সাহেবকে শেষ পর্যন্ত প্রহার করতে বাধ্য হন। এর ফলে তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। কিন্তু অবশেষে স্যার আশুতোষের চেষ্টায় সুভাষচন্দ্র স্কটিশ চার্চ কলেজে ভরতি হন এবং সেখান থেকে বি. এ. পাস করেন।

এর পর সুভাষচন্দ্র পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী বিলেত যান আই-সি-এস পড়বার জন্য। সেই পরীক্ষাতেও তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন এবং ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু শেষ অবধি ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে আই-সি-এস পদ বর্জন করেন এবং তার পরের বছর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে ট্রাইপস্ নিয়ে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরে আসেন।

সরকারী চাকরির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না। সারা দেশে তখন মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধুর নেতৃত্ব চলেছে অসহযোগ আন্দোলন। তিনি এসেই এই আন্দোলনে যোগ দিলেন।

ধীরে ধীরে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে তিনি গ্রহণ করলেন এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাঁর সংগঠনীশক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি পর পর দু বছর জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তাও তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের সংগে মতবিরোধ হওয়ায় কংগ্রেস দল

ত্যাগ করে তিনি "ফরওয়ার্ড ব্লক" নামে একটি নূতন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন।

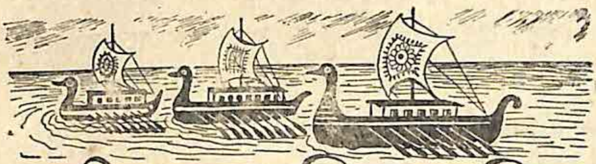
সুভাষচন্দ্রের ছিল আপোসবিরোধী মনোভাব। ফলে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করে। পরে স্বাস্থ্যহানির জন্য তিনি মুক্তি লাভ করেন।

তখন চলেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকাকালীন হঠাৎ তিনি নিরুদ্দিষ্ট হন। নানা কৌশলে আত্মগোপন করে তাঁকে দেশ থেকে দেশান্তরে যেতে হয়। প্রথমে জার্মানী হয়ে যান জাপানে এবং সেখান থেকে গোপনে চলে আসেন সিঙ্গাপুরে। সিঙ্গাপুর তখন জাপানীদের দখলে এবং সেই সময়ে সিঙ্গাপুরের বন্দী ভারতীয় সৈন্যরা রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' নামে একটি স্বাধীন সৈন্যদলে রূপান্তরিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র এসে রাসবিহারী বসুর এই দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করেন। সুভাষচন্দ্র তখন সবার কাছে 'নেতাজী' নামে পরিচিত। এরপর শুরু হয় ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে যাট হাজার সৈন্যের ঐতিহাসিক অভিযান—দিল্লী চলো! প্রবাসী ভারতীয়রা সেদিন দেশের মুক্তির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছিল নেতাজীর হাতে। শোনা যায়, একটি সভায় নেতাজীর গলার মালাটি বার লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছিল। প্রবাসী ভারতীয়দের মনেও ছিল এমনি তীব্র দেশপ্রেম!···

নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ বাহিনী সাফল্যের সঙ্গে ভারতের পূর্ব সীমান্ত অবধি এসে হানা দিল। ইম্ফল অধিকার করলো। এমন কি সেদিনকার কালাপানি—কুখ্যাত আন্দামানেও ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করলো। কিন্তু এর পর যুদ্ধের মোড় গেল ঘুরে। জাপানীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। ফলে, খাদ্য ও রসদের অভাব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে আজাদ হিন্দ বাহিনীও কর্মতৎপরতা

হয়ে পড়লো শিথিল। নেতাজীর 'দিল্লী অভিযান' স্বপ্ন আর সার্থক হলো না।···এর কিছুদিন পরই সংবাদ আসে—বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী মারা যান···এ সংবাদ বিশ্বাস করে নি দেশবাসী। তাই আজও অনেকে মনে করেন—নেতাজী জীবিত আছেন। সত্যিই তো—মহান নেতার এ মৃত্যু বিশ্বাসযোগ্য নয়।

A life sketch of Netaji Subhashchandra.



প্রাচীন বাংলার শিল্প ও বাণিজ্য

মিহির মজুমদার

[**লেখক পরিচিতি :** প্রবন্ধকার হিসেবে এঁর খ্যাতি আছে।]

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশ তার জন্মলগ্ন থেকেই ছিল জননী বসুন্ধরার আদরণীয়া দুহিতা। তার বাতাসে পুষ্পের সৌরভ, মাটিতে সোনার ফসল। বলা বাহুল্য, বাংলার এই সম্পদ প্রাচুর্য এবং ঐশ্বর্যই তার সর্বনাশের কারণ হয়েছে। দেশ বিদেশের লুব্ধকেরা লোলুপ দৃষ্টি হেনেছে এই কোমলপ্রাণা বাংলার উপর। তাই এখানে যুগে যুগে কালে কালে হয়েছে শাসক বদল তথা রাজা বদল।

অবশ্য যতদিন পর্যন্ত এই বাংলা দেশের শাসনকর্তার পদে হিন্দু রাজগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন—ততদিন রাজ্যের মধ্যেও একটা স্থিতিস্থাপকতা ছিল। খ্রীষ্টীয় ৭ম থেকে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস গৌরবময়। বিখ্যাত পাল এবং সেন রাজাগণ এই সময়ে বাংলার রাজপদে সমাসীন ছিলেন।

এই সময় বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং অন্যান্য ধর্ম দুইই পাশাপাশি বর্তমান ছিল। বরং বলা যায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচারধর্মিতাই একে আপামর জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল। এছাড়া ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মের ফাঁকে ফাঁকে আরেকটি নবতম ধর্ম ও সমাজের নিম্ন অবহেলিত জনগণের সহায়তায় তার রস সঞ্চয় করে করে বড় হয়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য—এই ধর্ম তন্ত্রাচারসর্বস্ব। তৎকালীন প্রসিদ্ধ স্মার্ত শূলপাণি, শ্রীনাথ আচার্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনু, পরাশরোক্ত সংহিতার যথার্থতা বিচারে প্রবৃত্ত হলেও, এইসব অর্বাচীন শৈব এবং তান্ত্রিক ধর্মচারকেও একেবারে অপাংক্তেয় করে দেন নি।

অবশ্য বল্লাল সেন যখন ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু জাতির চর্তুবর্ণ লোপের আশংকা করেন, তখন তাঁর প্রসিদ্ধ 'দানসাগর' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং এতেই তিনি তান্ত্রিক এবং এই শ্রেণীর অর্বাচীন গ্রন্থগুলিকে মূল্যহীন করে দেন।

কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের রচনা থেকেই আমরা বঙ্গ দেশের নাম পাই। এই সম্পর্কে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"কালিদাস যখন রঘুবংশ লিখেন, তখন বাঙ্গালী নৌযুদ্ধপটু ছিল এবং তখন বাঙ্গালী স্বাধীন ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, বালী ও যবদ্বীপেও বাঙালীর জয় পতাকা উড়িয়াছিল। সমুদ্রযাত্রা ও সামুদ্রিক রাজ্য-জয়ে বাঙালী যেমন যোগ্যতা দেখাইয়াছে, এখন ভারতবর্ষের আর কোন জাতি দেখাইতে পারে নাই।"

এর পর ৭ম শতাব্দীতে যখন চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ ভারতে আসেন—তখন তাঁর লেখায় বাংলা দেশের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন—'সমতটের লোকেরা স্বভাবতই শ্রমসহিষ্ণু তাম্রলিপ্তির অধিবাসীরা দৃঢ় ও সাহসী, কিন্তু চঞ্চল ও ব্যস্তবাগীশ, এবং কর্ণসুবর্ণীরা সাধু ও অমায়িক।' বাংলায় সাধারণতঃ বেদ মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, অর্থশাস্ত্র, গণিত,

জ্যোতিষ, কাব্য, তর্ক, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দ, আয়ুর্বেদ, অস্ত্রবেদ, তন্ত্র প্রভৃতির পঠন-পাঠন হত।

প্রসিদ্ধ কবি ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্যগ্রন্থে সেন রাজধানী 'বিজয়পুরের' যে উল্লেখ দেখি, তা থেকে এই অনুমান করা যায় যে সেকালে বাংলায় স্থাপত্য শিল্প, কারুশিল্প এবং নানারকম হস্ত শিল্পে বাঙালীর সুযশ ছিল।

পাল রাজধানী রামাবতী প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—'কনক পরিপূর্ণ ধবল প্রাসাদশ্রেণী মেরু-শিখরের ন্যায় প্রতীয়মান হইত এবং ইহার উপর স্বর্ণকলস শোভা পাইত; নানা স্থানে মন্দির, স্তূপ, বিহার, উদ্যান, পুষ্করিণী, ক্রীড়াশৈল, ক্রীড়াবাপী নগরের শোভা বৃদ্ধি করিত। হীরক, বৈদূর্যমণি, মুক্তা, মরকত, মাণিক্য ও নীলমণি খচিত আভরণ, বহুবিধ স্বর্ণখচিত তৈজসপত্র ও অন্যান্য গৃহোপকরণ, মহামূল্য বিচিত্র সূক্ষ্ম বসন, কস্তুরী, কুঙ্কুম ও কর্পূরাদি গন্ধ দ্রব্য এবং নানা যন্ত্রোত্থিত ঐশ্বর্য, সম্পদ, রুচি ও বিলাসিতার পরিচয় প্রদান করিত।'

বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্পে প্রাচীন কালেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ক্ষৌম, দুকূল, পত্রোর্ণ ও কার্পাসিক বস্ত্রের উল্লেখ আছে। বাংলার মসলিন শিল্প ছিল জগদ্বিখ্যাত। পাহাড়-পুরের ধ্বংসবিশেষ থেকে পোড়ামাটির কাজ এবং তৈজসপত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। তৎকালে তন্তুবায়, গন্ধবণিক, স্বর্ণকার, কর্মকার, কুম্ভকার, কংসকার, শঙ্খকার, মালাকার, তক্ষক, তৈলকার প্রভৃতি বৃত্তিগত জাতির উল্লেখই প্রমান করে যে বাংলাদেশ প্রাচীনকাল হতেই সুসভ্য ছিল। শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বানিজ্যও প্রসার লাভ করে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে বাণিজ্যের উপায় ছিল মূলতঃ নদীপথ। অবশ্য বড় বড় সরণীরও উল্লেখ আছে। বাংলার বাণিজ্য শুধুমাত্র দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। স্থল এবং জলপথে দেশের এবং বিদেশেরও যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। বাঙালী

বণিকেরা গঙ্গা নদী ধরে জাহাজে অথবা বড় বড় নৌকায় দক্ষিণ ভারত, লঙ্কাদ্বীপ, সুবর্ণভূমি অর্থাৎ ব্রাহ্মদেশ, মালয়, জাভা, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করতে যেত। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে আমরা চাঁদ সদাগর, শ্রীমন্ত, ধনপতি সদাগরের বাণিজ্য যাত্রার কথা জানতে পারি। বাঙালী বণিকেরা এদেশ থেকে মসলিন, মুক্তা, হাতির দাঁতের কারুকার্য, গাছগাছড়া এবং নানা প্রকার গন্ধদ্রব্য মশলাপাতি নিয়ে বানিজ্যে যেত। সুবর্ণগ্রাম, তাম্রলিপ্ত, গঙ্গে প্রভৃতি বন্দর ছিল তখনকার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। প্রাচীনকালের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনও আমরা তাম্রলিপ্ত, পাহাড়পুর' বগুলাড়া, পোখর্ণা (বাঁকুড়া) প্রভৃতি অঞ্চলে পেয়েছি। এ থেকেই বোঝা যায় যে বঙ্গদেশ এক সময়ে শিল্পে বাণিজ্যে তথা সভ্যতায় ভারতের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল।

me acquaintances of trade commerce and
industries of ancient Bengal.



এভারেস্ট বিজয়

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

[**লেখক পরিচিতি ঃ** সহজ এবং সুন্দর ভাষায় সাহিত্য রচনা করে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ অসামান্য খ্যাতি লাভ করেন। অসামান্য পণ্ডিত এই লেখক শুধু প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেই নয়, অনুবাদের ক্ষেত্রেও অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। শিশু সাহিত্যিক হিসেবেও এঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।]

ভারবাহী শেরপাদের বাদ দিয়ে হিমালয়ের এই শেষ অভিযানে কর্নেল হাণ্টের নায়কত্বে তের জন নির্ধারিত পর্বত-আরোহী ছিলেন।

এই তের জনের মধ্যে একজন হলেন ভারতীয়—তেনজিং আর দুজন হলেন নিউজিল্যাণ্ডবাসী, বাকি সকলেই ইংরেজ। তাঁদের নাম হল, কর্নেল হাণ্ট (নায়ক) মেজর, উইলি, নইস, বুর্দিলো, গ্রেগরী ব্যান্ড, ইভান্স্, হিলারী, লাওয়ি, ওয়েস্টম্যাকট, ওয়ার্ড, পাফ্, স্টোবার্ট ও তেনজিং।

এভারেস্ট-অভিযানের* যাত্রাকেন্দ্র হল নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডু। এখানেই নানা দিক থেকে অভিযাত্রীরা সকলে এসে মিলিত হন এবং এখান থেকেই কুলীদেরও সংগ্রহ করা হয়। আগেকার অধিকাংশ অভিযানের মত এই অভিযানও 'আলপাইন ক্লাব' আর ইংলণ্ডের জগৎ-বিখ্যাত 'রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির' যুক্ত তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়।

ইতিমধ্যেই তেনজিং-এর কাছে আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে গিয়েছিল। তেনজিংকে বাদ দিয়ে কোন এভারেস্ট-অভিযান গঠিত হতে পারে না। কিন্তু সুইস-অভিযান থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তেনজিং অতি কঠিন ম্যালেরিয়া রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তাঁর শরীর রীতিমত দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু এভারেস্টের আমন্ত্রণ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেহ মন থেকে সমস্ত জড়তা ঝেড়ে ফেললেন। ঘরের শান্ত, স্নিগ্ধ, মমতাময় জীবনকে পেছনে ফেলে রেখে তিনি ছুটলেন মৃত্যুসঙ্কুল সেই ভয়ঙ্করের পথে।

ভয়ঙ্কর যাদের ডাকে, কোন বন্ধনই আর তাদের ধরে রাখতে পারে না। তিনি কাঠমণ্ডুতে এসে অভিযাত্রীদের সঙ্গে যোগদান করলেন এবং প্রথমেই কর্নেল হাণ্টকে জানালেন, তিনি এই অভিযানে যোগদান করবার জন্যই এসেছেন; কিন্তু তাঁর একটা সর্ত আছে, সে-সর্ত মেনে না নিলে তিনি এই অভিযানে যোগদান করবেন না। সে-সর্ত হল তাঁকে পুরোপুরি অভিযাত্রী বলে মেনে নিতে হবে

* অভিযানটি ১৯৫৩ সালে পরিচালিত হল।

এবং তিনি যদি সক্ষম হন, তা হলে তাঁকে একাই এভারেস্টর চূড়ার দিকে অগ্রসর হবার অধিকার দিতে হবে।

কাঠমণ্ডুতে ব্রিটিশ এম্‌বেসীতে এই নিয়ে সভা বসল এবং সভায় স্থির হল, তেনজিং-এর সর্ত স্বীকার করা হবে। তেনজিং আনন্দে অভিযানের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। চারিদিক থেকে কুলীরা আসতে লাগল। তেনজিং তার ভেতর থেকে লোক বাছাই করতে লাগলেন।

সমস্ত আয়োজন শেষ হয়ে গেলে, দু-দলে অভিযানকে ভাগ করা হল। প্রথম দলে রইল ন'জন অভিযাত্রী, একশো বাযট্টী জন ভারবাহী আর আঠারো জন শেরপা। দ্বিতীয় দলে রইলেন স্বয়ং কর্নেল হাণ্ট আর তিন জন অভিযাত্রী, দু'শো জন ভারবাহী, আর দু'জন শেরপা। সমস্ত মালের ওজন হল সতেরো শো পাউণ্ড।

কাঠমণ্ডু থেকে অভিযান যাত্রা করল নামচে বাজারের দিকে—কাঠমণ্ডু থেকে একশো সত্তর মাইল দূর। এই নামচে বাজার থেকে প্রকৃতপক্ষে সুরু হয় আসল অভিযান। এই একশো সত্তর মাইল পথ এত দুরূহ আর দুর্গম যে, অভিজ্ঞ নেপালী শেরপারা ছাড়া এই পথ দিয়ে কেউ অগ্রসর হতে পারে না। অন্য পথ দিয়ে অবশ্য নামচে বাজারে পৌঁছানো যায়, কিন্তু তাতে সময় লাগে ঢের বেশী।

থায়াংবক থেকে সুরু হয়েছে এভারেস্টের তুষারক্ষেত্র। একটা বিরাট গ্লেসিয়ারের প্রান্তেই থায়াংবক। এইখানে সমস্ত অভিযান তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করে রইল। কারণ এইখানে হিমালয়ের তুহিন-প্রকৃতির সঙ্গে অভিযাত্রী আর শেরপাদের নিজেদের অভ্যস্ত করে তুলতে হয়। তা ছাড়া এইখান থেকেই সুরু হয় পথ-ঘাট জরিপ করে দেখা। নতুন কোন ভাল পথ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা, সামনের পথের অবস্থা কি রকম, পরবর্তী তাঁবু কোন জয়াগায় স্থাপন করা সম্ভব হবে, সব এইখান থেকেই নির্ধারিত হয়।

থায়াংবকে এক বৌদ্ধ মঠ আছে। ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়, হিমালয়ের এই দূর দুর্গমতার মধ্যে এই অনন্ত তুষারের রাজ্যেও সর্বত্র মঠ-মন্দির আছে, আর সেই মঠ ও মন্দিরে যুগ-যুগান্ত ধরে ইষ্টের আরাধনা চলেছে।

থায়াংবক মাঠের বৌদ্ধ শ্রমণেরা অভিযাত্রীদের আশীর্ব্বাদ করলেন।

থায়াংবক মাঠের সামনে থেকেই সুরু হয়েছে বিশাল খুম্বু গ্লেসিয়ার বা হিমবাহ। এই হিমবাহ পেরিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এইখান থেকেই বাতাস খুব পাতলা হয়ে আসে। তাই এখানে কয়েক দিন বাস ক'রে এই পাতলা বাতাসকে সহ্য করে নিতে হয়।

আটাশে তেনজিং আর হিলারী সাত নম্বর তাঁবু থেকে যাত্রা করলেন। তাঁরা ঠিক করলেন, সোজা এভারেস্টর চূড়ার দিকে অগ্রসর না হয়ে, তাঁরা যত উঁচুতে পারেন, এমনভাবে আট নম্বর তাঁবু ফেলবেন যে, যাত্রা করে রাত্রির বিশ্রামের পর পরের দিন সকালবেলা তাঁরা শেষ তিনশো কি সাড়ে তিনশো ফুট জয় করে ফিরে আসতে পারেন। এই উচ্চতায় তাঁদের সঙ্গে আর একজন তরুণ শেরপাও এসেছিল,—তার নাম আংগনিমা। তাঁদের দু'জনকে সাহায্য করবার জন্য গ্রেগরী, লাওয়ি আর আংগনিমাকে পাঠান হয়।

সাত নম্বর তাঁবু থেকে পথ প্রায় খাড়া সোজা ওপরের দিকে উঠে গিয়েছে, প্রত্যেক পদে নিজের হাতে বরফ কেটে ধাপ তৈরী করে সেই খাড়া পথে উঠতে তাঁদের দুজনেরই মেরুদণ্ড যেন ভেঙে পড়তে লাগল। তার ওপর তাঁরা ভীত হয়ে দেখলেন, তাঁদের অক্সিজেন যন্ত্রের অক্সিজেন প্রয়োজনীয় মাত্রা থেকে অনেক কমে গিয়াছে। তখন বাধ্য হয়ে তাঁরা কম মাত্রায় অক্সিজেন নিতে লাগলেন।

কিন্তু সেই খাড়া পাহাড়ের গায়ে কোথাও একটা তাঁবু ফেলবার মতন সামান্য জায়গাও পাওয়া গেল না। গত বৎসর তেনজিং সুইস

অভিযাত্রীদের সঙ্গে এই পথেই এসেছিলেন, সেই সময় তিনি একটা জায়গা লক্ষ্য করেছিলেন। বহু খোঁজাখুঁজির পর তেনজিং সেই জায়গা বার করলেন এবং সাতাশ হাজার আটশো ফুটে আট নম্বর তাঁবু ফেলা হল।

এর আগে এত উঁচুতে আর কোনও তাঁবু ফেলা হয়নি। এই তাঁবুতে কোন রকমে একজন মানুষ ধরে। তাই থাকার মতন করে তেনজিং আর হিলারী সেই ছোট্ট তাঁবুতে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করলেন। সঙ্গে যে সাহার্যকারী দল এসেছিল, তাঁরা ফিরে গেল। তেনজিং আর হিলারী সেই তুষার-নীড়ে কম্পিত বুকে রাত-প্রভাতের অপেক্ষায় রইলেন।

উনত্রিশে ভোর ছ'টা বাজতেই তেনজিং আর হিলারী শেষ অভিযানের জন্যে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ন'টার সময় তাঁরা দক্ষিণ চূড়ায় এসে উঠলেন, সেখান থেকে এভারেস্টের মূল চূড়া হল আর আধ মাইল মাত্র। সেখানে এসে মিনিট দশেক তাঁরা একটু বিশ্রাম করে নিলেন। মুখ থেকে অক্‌সিজেন নেবার মুখোশটা খুলে ফেললেন, দেখলেন বিশেষ কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

অক্‌সিজেন-যন্ত্রের দিকে চেয়ে তাঁরা ভীত হয়ে ওঠেন। যেটুকু অক্‌সিজেন আছে, তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। স্বাভাবিক মাত্রায় যদি নেওয়া হয়, তা হলে চূড়ায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই ফুরিয়ে যাবে, তখন হিসেব করে তাঁরা অক্‌সিজেনের মাত্রা কমিয়ে দিলেন। তাতে অবশ্য নিঃশ্বাস নিতে একটু অসুবিধা হতে লাগল। কিন্তু দুর্জয় পণ যাঁদের মনে, তাঁরা সব অসুবিধার উপর দিয়ে দাঁড়াতে পারেন।

সেখান থেকে সেই আধ মাইল পথ অতিক্রম করতে আড়াই ঘণ্টা লাগল। সাড়ে এগারোটার সময় তেনজিং এভারেস্টের চূড়ায় গিয়ে উঠলেন, তারপর হিলারীকে হাত বাড়িয়ে উপরে তুলে নিলেন। পঞ্চাশ বছর ধরে মানুষের অবিরাম অবিশ্রান্ত সাধনা সেদিন জয়যুক্ত হল।

এভারেস্টের চূড়ায় কে প্রথম উঠেছিলেন, এই নিয়ে বহু বাদানুবাদ হয়। এ কথা নিঃসন্দেহ যে, তেনজিংই প্রথম এভারেস্টের চূড়ায় পদার্পণ করেন।

চূড়ায় পদার্পণ করে তেনজিং নতজানু হয়ে ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করলেন—সঙ্গে যে চকলেট আর বিস্কুট ছিল, তারই অর্ঘ্য মাটিতে রেখে ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করলেন।

তেনজিং তারপর নেপাল আর ভারতের পতাকা সেখানে পুঁতলেন। তাঁর এক বাঙালী বন্ধু একটি ছোট ত্রিবর্ণ পতাকা তাঁর হাতে দেন। বন্ধুর দেওয়া সেই ছোট্ট পতাকাটুকু রাখল ভারত রাষ্ট্রের সম্মান।

The Story of the Everest expedition

দেশের শ্রীবৃদ্ধি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[**লেখক পরিচিতি ঃ** 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের উদ্গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ১৮.৮ খ্রীস্টাব্দে ২৪ পরগণার অন্তর্গত কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিতে এঁর অবদান অসামান্য। ইনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদ ও হাস্যরসিক। 'আনন্দমঠ,' 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'চন্দ্রশেখর', 'বিষবৃক্ষ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'রাজসিংহ', সীতারাম', 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি এঁর রচিত অমর গ্রন্থ। ১৮৯৪ সালে মৃত্যুপথে পতিত হন।]

আজি-কালি বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এতকাল আমাদিগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরেজের শাসন-কৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি, আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে।

কি মঙ্গল, দেখিতে পাইতেছ না? ঐ দেখ, লৌহ-বর্ত্মে লৌহ-তুরঙ্গ,

কোটি উচ্চৈঃশ্রবাকে বলে অতিক্রম করিয়া, এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে। ঐ দেখ, ভাগীরথীর যে উত্তাল তরঙ্গমালায় দিগ্‌গজ ভাসিয়া গিয়াছিল, অগ্নিময়ী তরণী ক্রীড়াশীল হংসের ন্যায় তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া বাণিজ্যদ্রব্য বহিয়া ছুটিতেছে। কাশীধামে তোমার পিতার অদ্য প্রাতে সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে—বিদ্যুৎ আকাশ হইতে নামিয়া তোমাকে সংবাদ দিল, তুমি রাত্রিমধ্যে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলে। যে রোগ পূর্বে আরাম হইত না, এখন নবীন চিকিৎসাশাস্ত্রের গুণে ডাক্তারে তাহা আরাম করিল। যে ভূমিখণ্ড নক্ষত্রময় আকাশের ন্যায় অট্টালিকাময় হইয়া এখন হাসিতেছে, আগে উহা ব্যাঘ্র-ভাল্লুকের আবাস ছিল। ঐ যে দেখিতেছ রাজপথ, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থানে সন্ধ্যার পর হয় কাদার পিছলাইয়া পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া থাকিতে, না হয় দস্যুহস্তে প্রাণত্যাগ করিতে, এখন সেখানে গ্যাসের প্রভাবে কোটি চন্দ্র জ্বলিতেছে। তোমার রক্ষার জন্য তাহারা দাঁড়াইয়া আছে।

যে ব্যক্তি দূরবীণ সাহায্যে বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগণের গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জন্মিলে উনি এতদিন চাল-কলা-ধূপ-দীপ দিয়া বৃহস্পতির পূজা করিতেন। আর আমি যে হতভাগ্য চেয়ারে বসিয়া ফুলিস্কেপ কাগজে বঙ্গদর্শনের জন্য সমাজতত্ত্ব লিখিতে বসিলাম, একশত বৎসর পূর্বে হইলে আমি এতক্ষণ ধরাসনে পশুবিশেষের মত বসিয়া ছেঁড়া তুলট নাকের কাছে ধরিয়া নবমীতে লাউ খাইতে আছে কিনা, সেই কচকচিতে মাথা ধরাইতাম। তবে কি দেশের মঙ্গল হইতেছে না? দেশের বড় মঙ্গল—তোমরা একবার মঙ্গলের জন্য জয়ধ্বনি কর।

এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে। কাহার এত মঙ্গল? হাসিম শেখ, আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে খালি মাথায়, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থি-চর্ম-বিশিষ্ট বলদের সাহায্যে ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে,

উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তাহা নিবারণের জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে, ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময় সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাথরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত নুন ও লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে, তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় ভূমে গোহালের একপাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহার পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে—যাইবার সময় হয় জমিদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয়ত চষিবার সময় জমিদার জমিখানি কাড়িয়া লইবেন, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস—সপরিবারে উপবাস। বল দেখি চশমা-নাকে-বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদের কি মঙ্গল করিয়াছ? আর তুমি ইংরেজ বাহাদুর, তুমি যে মেঝের উপর এক হাতে হংস-পক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডুয়িত করিতেছ, তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে এই হাসিম শেখ, আর রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে?

আমি বলি অণুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার ও আমার মঙ্গল দেখিতেছি, তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশের কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবি। যেখানে কৃষকদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের মঙ্গল নাই।

The poor and downtrodden should feel
... development of the country."

বাঙালীর শিল্পোদ্যম

বিনয় ঘোষ

[বিনয় ঘোষের খ্যাতি মূলত গবেষক হিসাবে। বাঙ্গালীর সংস্কৃতি-বিষয়ে গবেষণা করিয়া তিনি বিস্তর খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। 'কালপেঁচা' ছদ্মনামেও ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 'কালপেঁচার বঙ্গদর্শন' ইহার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ।]

প্রাচীন যুগ থেকে প্রায় মধ্যযুগের প্রান্ত পর্যন্ত ইতিহাসে বাঙালীর বাণিজ্যিক কৃতিত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা প্রধানতঃ কুলবৃত্তিগত বাণিজ্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কয়েকটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের মধ্যে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। বর্ধমান জেলায় গলসী থানার অধীন মল্লসারুল গ্রামে ষষ্ঠ খ্রীস্টাব্দের অর্থাৎ প্রাচীন গুপ্তযুগের, একটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে। এই তাম্রশাসনে এই অঞ্চলের তদানীন্তন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নাম পাওয়া যায়। যেমন বক্তক বা বাক্তার্ হিমদত্ত, বটবল্লকের ষষ্ঠী দত্ত, শ্রী দত্ত, গোধগ্রামের মহি দত্ত ও রাজ্য দত্ত। এই দত্ত-রা কারা? পশ্চিমবঙ্গের গন্ধবণিক্ তাম্বুলিবণিক প্রভৃতি বণিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে 'দত্ত'রা অন্যতম। এঁরা মনে হয় এই বণিক্ দত্তদেরই প্রাচীন পূর্বপুরুষ। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এঁরা এক-একটি অঞ্চলের বিশেষ অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন, প্রধানতঃ তাঁদের বাণিজ্যিক প্রতিপত্তির জন্য। বাংলাদেশের এই বণিক্-সম্প্রদায় বংশপরম্পরায় বাণিজ্য করে প্রচুর বিত্ত ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। হাজার-বারোশ বছর পরেও এই বণিক্দের প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে। উজানির ধনপতি-সদাগর 'গন্ধবণিক্ জাতি বিদিত অবনী।' 'বিদিত অবনী' কথা থেকে বোঝা

যায়, বাঙালী বণিক্‌রা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশেও বাণিজ্য করতে যেতেন। উজানি নগরে ছিল ধনপতির বাস। অজয় নদের তীরে, বর্ধমানের উজানি-কোগ্রাম এই উজানি নগর। কেবল ধনপতি সদাগরের উজানি নয়, চাঁদ সদাগরের চম্পক-নগরও এই অঞ্চলে। খুল্লনার পাত্র-নির্বাচন প্রসঙ্গে বণিক্‌দের যেসব নাম ও বসতির উল্লেখ আছে তা এই—চম্পকনগরের চাঁদ সদাগর, বর্ধমানের ধুস দত্ত ও সোম দত্ত, সাঁতগাঁর বা সপ্তগ্রামের রাম দাঁ, বড়শুলের হরি দত্ত, ফতেপুরের রাম কুণ্ডু, কর্জনার হরি লাহা, ভাল্লকির সোম চন্দ্র। ধনপতি সদাগরের পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উজানিতে বিভিন্ন অঞ্চলের বহু বণিকের সমাগম হয়েছিল। তাঁদের নামধামের তালিকা আরও বিস্তৃত। সাতশত বণিকের সমাগম হয়েছিল ধনপতি সদাগরের গৃহে। যে সমস্ত গ্রাম থেকে তাঁরা এসেছিলেন তার প্রায় প্রত্যেকটি গ্রাম আজও স্বনামে বর্তমান রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে দামোদর অজয় দ্বারকেশ্বর সরস্বতী প্রভৃতি নদনদীর তীরে গ্রামগুলি প্রতিষ্ঠিত। আশ্চর্য হল, এইসব অঞ্চলের গ্রামীণ সমাজে আজও দেখা যায় বণিক্‌-সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি সর্বাধিক। গ্রামে পা দিলেই এই অঞ্চলে আজও সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী বড় বড় অট্টালিকাবহুল যেসব পাড়া দেখা যায়, সেগুলি প্রধানতঃ বণিক্‌-সম্প্রদায়ের পাড়া।

বাণিজ্য বাংলার বণিক্‌দের কুলবৃত্তি। এই কুলবৃত্তির ঐতিহ্য বর্তমান কাল পর্যন্ত বাঙালী বণিক্‌রা অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছেন। বর্ধমান বাঁকুড়া হুগলি প্রভৃতি জেলায় নয় শুধু, কলকাতা শহরেও আঠার শতক থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে বাঙালী বণিক্‌-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে দেখা যায়। কলকাতা শহরে বাঙালী শেঠ বসাক প্রভৃতি তন্তুবণিক্‌দের ইতিহাস এবং তাম্বুলি প্রভৃতি অন্যান্য বণিক্‌-সম্প্রদায়ের ইতিহাস থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য হ'ল, উনিশ শতকে তো নয়ই, বিশ শতকেও বর্তমানকাল পর্যন্ত বাঙালী বণিক্‌-সম্প্রদায়ের মধ্যে

স্বাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠার পথে বিশেষ কেউ দুঃসাহসিক অভিযান করেছেন ব'লে জানা যায় না। কুলবৃত্তিগত বাণিজ্যের সীমা তাঁরা হয়তো শাখা-প্রশাখায় বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন, কিন্তু সীমা লঙ্ঘন ক'রে ধনতান্ত্রিক যুগের প্রকৃত শিল্পোদ্‌যোগীর মতো আধুনিক শিল্প-প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হননি। কেন হননি তা বাস্তবিকই ভাববার বিষয়। স্বাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠার উপযোগী পর্যাপ্ত মূলধন সঞ্চয় করেছেন এরকম ব্যবসায়ীর অভাব নেই এঁদের মধ্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন এঁরা বাণিজ্যমুখী হ'লেও স্বাধীন শিল্পমুখী হননি? কেন এঁরা প্রসিদ্ধ 'ব্যবসায়ী' হ'তে চান, 'শিল্পপতি' হ'তে চান না? তার অন্যতম কারণ মনে হয়, বেচা-কেনার বাণিজ্য মুনাফার যে নিশ্চিন্ততা আছে, শিল্পোদ্যমে তা নেই। রক্ষণশীল মন নিশ্চিন্ততার আশ্রয়ে ডানা গুটিয়ে থাকতে চায়, গতিশীল মনের মতো অবাধে ডানা বিস্তার করতে চায় না অনিশ্চিতের সন্ধানে। শিল্পোদ্‌যোগী পুরুষের মন দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর মতো বন্ধনমুক্ত, স্বাধীন ও কৃতিত্বকামী। বাঙালী বণিক্‌-সম্প্রদায় যেমন কুলবৃত্তিগত রক্ষণশীলতা শেষ পর্যন্ত ছাড়তে পারেননি, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের বাঙালী যাঁরা বাণিজ্যক্ষেত্রে ব্রিটিশ আমলে পদার্পণ করেছিলেন, তাঁরাও বেশিদূর পর্যন্ত স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারেন নি।

Failures of Bengalees in the running of industries.

একলব্য

কাশীরাম দাস

[কবি পরিচিতি ঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলার সিঙ্গি গ্রামে কবিবর কাশীরাম দাসের জন্ম হয়। বাংলা পদ্যে ইনিই প্রথম 'মহাভারত' অনুবাদ করে এই মহাগ্রন্থকে সাধারণ বাঙ্গালীর কাছে জনপ্রিয় তোলেন। কৃত্তিবাসী 'রামায়ণের' মতই কাশীরাম দাসের মহাভারত বাংলার ঘরে ঘরে পঠিত হয়।]

অর্জুনেরে সাথী করি' আচার্য তখন।
উপনীত হ'ল যথা নিষাদ-নন্দন॥
একলব্য দ্রোণে দেখি' প্রণাম করিল।
কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রেতে দাঁড়াইল॥
দ্রোণ বলিলেন যদি তুমি শিষ্য হও।
তবে গুরুদক্ষিণা আমারে আজি দাও॥
একলব্য বলে প্রভু মম ভাগ্যবশে।
কৃপা করি' তুমি প্রভু এলে মম পাশে॥
সকল দ্রব্যেতে হয় গুরু অধিকার।
যা কিছু আমার কাছে সকলি তোমার॥
আজ্ঞা কর প্রভু করিলাম অঙ্গীকার।
প্রাণ যদি চাও দিব শ্রীপদে তোমার॥
দ্রোণ বলিলেন যদি আমারে তুষিবা।
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলি দিবা॥
ততক্ষণে কাটিয়া অঙ্গুলি গোটা দিল।
গুরু-আজ্ঞায় অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিল॥

তুষ্ট হইলেন গুরু আর ধনঞ্জয়।
মনে জানিলেন গুরু আমারে সদয় ॥
একলব্য-গুরুভক্তি দেখিয়া নয়নে।
স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে ॥

Devotion and duty to the teacher!

জন্মভূমির প্রতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[**কবি পরিচিতি** : ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাজনারায়ণ এবং মাতা জাহ্নবী দেবী। প্রথম যৌবনে খ্রীস্টধর্মের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে খ্রীস্টান হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'The Captive Lady' ইংরেজিতে রচিত। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা কাব্য ও নাটক-রচনা শুরু করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই কবিখ্যাতি লাভ করেন। 'মেঘনাদ বধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা' এবং 'বীরাঙ্গনা, কাব্যত্রয় এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন নাটিকাদুটির জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।]

রেখ মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ—
মধুহীন ক'রো না গো, তব মনঃ-কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে
জীব-তারা যদি খসে,
এ দেহ-আকাশ হ'তে, নাহি খেদ তাহে।

জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে ?
চিরস্থির করে নীর, হায় রে জীবন-নদে।
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি মা ডরি শমনে,
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে।
সে-ই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজনে।
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে সুবরদে।
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে
মানসে মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস—কি বসন্ত, কি শারদে !

Love and attachment for the motherland.

বঙ্গে শরৎ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে।
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জলধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর—
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন সভাতে।
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে, জননী,
শরৎকালের প্রভাতে।

জননী, তোমার শুভ আহ্বান
গিয়াছে নিখিল ভুবনে—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে।
অবসর আর নাহিক তোমার,
আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রাম পথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে
জননী, তোমার আহ্বান-লিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে।

তুলি মেঘভার আকাশ তোমার
করেছ সুনীল বরণি ;
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী।
স্থলে জলে আর গগনে গগনে
বাঁশি বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে, তব দ্বার তলে
দিশি দিশি হ'তে তরণী।

আকাশ করেছ সুনীল অমল,
স্নিগ্ধশীতল ধরণী।
বহিছে প্রথম শিশিরসমীর
ক্লান্ত শরীর জুড়ায়ে—
কুটিরে কুটিরে নব নব আশা
নবীন জীবন উড়ায়ে।

দিকে দিকে, মাতা কত আয়োজন—
হাসিভরা মুখ তব পরিজন
ভাণ্ডারে তব সুখ নব নব
মুঠা মুঠা লয়ে কুড়ায়ে—
ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার
নবীন জীবন উড়ায়ে।

মাতার কণ্ঠে শেফালী মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।

পরেছে কিরীট কনককিরণে
মধুর মহিমা হরিতে হরিণে,
কুসুমভূষণজড়িত চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী।
আলোক শিশির কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী।

ঝিঙে-ফুল

কাজী নজরুল ইসলাম

[**কবি পরিচিতি :** 'বিদ্রোহী কবি' নজরুল ১৮৯৯ সালে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধ থামলে দেশে এসে সাহিত্যসাধনা শুরু করেন এবং অচিরেই খ্যাতি লাভ করেন। সামাজিক অন্যায়-অবিচার, কুসংস্কার এবং হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে কবিদের মধ্যে ইনিই প্রথম প্রতিবাদ জানান। কবির বহু কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'অগ্নিবীণা' 'দোলন চাঁপা', 'সিন্ধুহিল্লোল', 'বিষের বাঁশী', 'বুলবুল' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি কবি পরলোকগমন করেছেন।]

ঝিঙে-ফুল! ঝিঙে-ফুল!
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ঝিঙে-ফুল—
ঝিঙে-ফুল॥
গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢল ঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলে দুল—
ঝিঙে-ফুল॥

ঝিঙে ফুল

পাতার দেশের পাখী বাঁধা হিয়া বোঁটাতে,
গান তব শুনি সাঁঝে তব ফুটে ওঠাতে।
পউষের বেলা শেষ
পরি জাফ্‌রানি বেশ
মরা মাচানের দেশ
ক'রে তোল মশ্‌গুল—
ঝিঙে-ফুল ॥

শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ খুকু রে
আলুথালু ঘুমু যাও রোদে-গলা দুকুরে।
প্রজাপতি ডেকে যায়—
'বোঁটা ছিঁড়ে চলে আয়।'
আস্‌মানে তারা চায়—
'চলে আয় এ অকূল।'
ঝিঙে-ফুল ॥

তুমি বল—'আমি হায়
ভালবাসি মাটি-মায়,
চাই না এ অলকায়—
ভাল এই পথ-ভুল।'
ঝিঙে-ফুল ॥

A musical poem on a very common flower

রাখাল ছেলে

জসিমউদ্দিন

[**কবি পরিচিতি :** বিখ্যাত পল্লীকবি জসিমউদ্দিন বাংলাদেশের ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর 'নকসী কাঁথার মাঠ', 'যোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যগ্রন্থ-দুটি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। দীর্ঘকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। এ বছর (১৯৭৬) মার্চ মাসে কবি পরলোকগমন করেছেন।]

"রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে, বারেক ফিরে চাও,
বাঁকা গাঁয়ের পথটি বেয়ে কোথায় চ'লে যাও ?"
"ওই যে দেখ নীল-নোয়ান' সবুজ-ঘেরা গাঁ,
কলার পাতা দোলায় চামর, শিশির ধোয়ায় পা।
সেথায় আছে ছোট্ট কুটীর সোনার পাতায় ছাওয়া,
সাঁঝ-আকাশের ছড়িয়ে-পড়া আবীর-রঙে নাওয়া ;
সেই ঘরেতে একলা ব'সে ডাকছে আমার মা—
সেথায় যাব, ও ভাই এবার আমায় ছাড় না।"
"রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে, আবার কোথা ধাও,
পূব-আকাশে ছাড়ল সবে রঙীন মেঘের নাও।"
"ঘুম হ'তে আজ জেগেই দেখি শিশির-ঝরা ঘাসে
সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে।
আমার সাথে করতে খেলা প্রভাত-হাওয়া, ভাই,
সরষে ফুলের পাপড়ি নাড়ি' ডাকছে মোরে তাই।
চল্‌তে পথে মটরশুঁটি জড়িয়ে দু'খান পা—
বলছে যেন, গাঁয়ের রাখাল একটু খেলে যা' !

সারা মাঠের ডাক এসেছে—খেলতে হবে ভাই,
সাঁঝের বেলা কইব কথা, এখন তবে যাই।”
“রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে, সারাটি দিন খেলা—
এ যে বড় বাড়াবাড়ি, কাজ আছে যে মেলা।”
“কাজের কথা জানিনে ভাই, লাঙল দিয়ে খেলি,
নিড়িয়ে দেই ধানের ক্ষেতের সবুজ রঙের চেলী।
ঝাউ-এর ঝাড়ে বাজায় বাঁশী পউষ-পাগল বুড়ি,—
আমরা সেথা চষ্‌তে লাঙল মুর্শীদা গান জুড়ি।
খেলা মোদের গান-গাওয়া, ভাই, খেলা লাঙল চষা,
সারাদিন ছুটোছুটি জানিইনেকো বসা।”

Life and activities of a rustic boy

রানার

সুকান্ত ভট্টাচার্য

[**কবি পরিচিতি ঃ** বর্তমান যুগের বহু-আলোচিত প্রতিভাধর কবি। সাবলীল, প্রাঞ্জল ও বলিষ্ঠ ভাষা এঁর কবিতাগুলোকে জনপ্রিয় করেছে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ছাড়পত্র’। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে ‘মিঠেকড়া’, ‘হরতাল’, ‘ঘুম নেই, সমধিক উল্লেখযোগ্য। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে মাত্র ২১ বছর বয়সে কবির মৃত্যু হয়।]

রানার ছুটেছে, তাই ঝুম্ ঝুম্ ঘণ্টা বাজছে রাতে।
রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে—
রানার চলেছে, রানার!
চলে রাত্রির পথে পথে কোনো নিষেধ জানে না মানার,

দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার—
কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার।
রানার! রানার!
জানা-অজানার বোঝা আজ তার কাঁধে,
বোঝাই-জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে।
রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয়, হয়,
আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার দুর্জয়।
তার জীবনের স্বপ্নের মতো পিছে স'রে যায় বন,
আরো পথ, আরো পথ—বুঝি হয় লাল দূরে পূর্বের কোণ!
অবাক্ রাতের তারারা আকাশে মিট্‌মিট্ ক'রে চায়—
কেমন মাটিতে রাণার সবেগে হরিণের মতো ধায়।
কত গ্রাম, কত পথ যায় স'রে স'রে
শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে,
হাতে লণ্ঠন করে ঠন্‌ঠন্ জোনাকিরা দেয় আলো,
মাভৈঃ, রানার! এখনো গলেনি জমাট রাতের কালো।

রানার! রানার!
এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে!
রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে?
ঘরেতে অভাব; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া,
পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া।
রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে,
দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে।
কত চিঠি লেখে লোকে—
কত সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কত না দুঃখে ও শোকে।
এর দুঃখের কথা জানবে না জানি কেউ কোনো দিনও,
এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ।

এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরে ও গ্রামে
এর কথা ঢাকা প'ড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে।
দরদে তার চোখ কাঁপে মিটিমিটি,—
এরে যে ভোরের আকাশ পাঠাতে সহানুভূতির চিঠি।
রানার! রানার! কী হবে এ বোঝা ব'য়ে?
কী হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে?
রানার! রানার! ভোর তো হয়েছে,—
আকাশ হয়েছে লাল,
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল?
রাণার! গ্রামের রানার।
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার।
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি
নেই দেরি, নেই আর—
ছুটে চলো, ছুটে চলো, আরো বেগে,
দুর্দম হে রানার॥

The life of a postal runner.

ভাড়াটে কুঠি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[**কবি পরিচিতি :** রবীন্দ্র পুরস্কার এবং অ্যাকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও কথা-সাহিত্যিক। 'সম্রাট' এবং 'সাগর থেকে ফেরা' তাঁর রচিত দুটি শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। শিশু সাহিত্য রচনায় এবং ছোট গল্প রচনাতেও ইনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।]

ভাড়াটে কুঠি।—
নদীর স্রোতের জঞ্জাল সম আসিয়া জুটি ॥
ওধারে তাহারা এধারে কাহারা
ওপরে ও নীচে নানা,
পাশাপাশি রোজ ঘর করি ভাই—
কেহ নয় কারো জানা!
শুধু দু'বেলায় চোখাচোখি হয়,
একই সিঁড়ি দিয়ে উঠি।
ভাড়াটে কুঠি ॥
একটি ইটের ব্যবধান রেখে
পাশাপাশি থাকি শুয়ে;
এ ছাতের জল ও ছাতে গড়ায়
ভিৎ গাড়া একই ভুঁয়ে।
এইখানে শেষ; তারপরে আঁটা
জানালা কবাট দুটি।
ভাড়াটে কুঠি ॥
একদিন ফের ঘূর্ণিতে টানে,
কোনখানে যাই ভেসে;
কিছু নাহি জানি, তবুও বিদায়
নিয়ে চলি ম্লান হেসে।
যা ছিল আড়াল রহে চিরকাল
বাধা নাহি যায় টুটি।
ভাড়াটে কুঠি ॥
শুধু কোনদিন সঙ্গ-বিহীন
বিদ্রোহ করে প্রাণ;
কঠিন দেয়ালে করাঘাত করে
ঘুচাইতে ব্যবধান।

ঘোচে না আড়াল, ব্যাকুল হৃদয়
মিছে মনে মাথা কুটি।
ভাড়াটে কুঠি॥

The A popular scene of tenants in a rented house

ছিন্ন মুকুল

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[**কবি পরিচিতি ঃ** 'ছন্দের জাদুকর' সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বিখ্যাত গদ্য-লেখক অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। জন্ম ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে, মৃত্যু ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যরীতি ভিন্ন—তাঁর কবিতায় ইতিহাস, পুরাণ এবং আধুনিক কালের নানা তথ্য স্থান পেয়েছে। 'কুহু ও কেকা', মণিমঞ্জুষা,' 'বেলাশেষের গান', 'অভ্র-আবীর' প্রভৃতি কবির উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।]

সবচেয়ে যে ছোট্ট পিঁড়িখানি
সেইখানি আর কেউ রাখে না পেতে!
ছোট্ট থালায় হয় নাকো ভাত বাড়া,
জল ভরে না ছোট্ট গেলাসেতে;
বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে যে ছোট
খাবার বেলায় কেউ ডাকে না তাকে।
সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল
তারি খাওয়া ঘুচেছে সব আগে
সবচেয়ে যে অল্পে ছিল খুশী,
খুশী ছিল ঘেঁষাঘেঁষির ঘরে,
সেই গেছে, হায়, হাওয়ার সঙ্গে মিশে,
দিয়ে গেছে জায়গা খালি ক'রে।
ছেড়ে গেছে পুতুল, পুঁতির মালা,
ছেড়ে গেছে মায়ের কোলের দাবি;

ভয়-তরাসে ছিল যে সবচেয়ে
সে-ই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবি।
চলে গেছে একলা চুপে চুপে
দিনের আলো গেছে আঁধার ক'রে;
যাবার বেলা টের পেলে না কেহ,
পারলে না কেউ রাখতে তারে ধ'রে,
চ'লে গেল পড়তে চোখের পাতা—
বিসর্জনের বাজনা শুনে বুঝি;
হারিয়ে গেল অজানাদের ভিড়ে,
হারিয়ে গেল—পেলাম না আর খুঁজি।
হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে, ওরে!
হারিয়ে গেছে বোল্-বলা সেই বাঁশী,
হারিয়ে গেছে কচি সে মুখখানি,
দুধে-ধোওয়া কচি চাঁদের হাসি।
আঁচল খুলে হঠাৎ স্রোতের জলে
ভেসে গেছে শিউলি ফুলের রাশি;
ঢুকেছে হায় শ্মশান-ঘরের মাঝে
ঘর ছেড়ে তাই হৃদয় শ্মশানবাসী।
সবচেয়ে যে ছোট্ট কাপড়গুলি
সেগুলি কেউ দেয় না মেলে ছাদে;
যে শয্যাটি সবার চেয়ে ছোট
আজকে সেটি শূন্য পড়ে কাঁদে।
সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল
সেই গিয়েছে সবার আগে সরে,
ছোট্ট যেজন ছিল সবার চেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য ক'রে।

without a baby, the house of a man
really empty

কামনা

হুমায়ুন কবির

[**কবি পরিচিতি ঃ** ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশের অন্তর্গত ফরিদপুর জেলায় হুমায়ুন কবির জন্মগ্রহণ করেন। কেবল কবি হিসাবেই নয়, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং রাজনীতিবিদ হিসেবেও তাঁর পরিচিত ছিল। দীর্ঘকাল ইনি 'চতুরঙ্গ' নামক একটি বিশিষ্ট সাহিত্য-পত্রিকা সম্পাদন করেছেন। এঁর বহু কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়।]

হে মোর দেবতা, প্রভু, মম চিত্ত-মাঝে
প্রকাশিত হও তব মহিমার সাজে।
ব্যথা দিয়ে, দুঃখ দিয়ে হিয়ারে আমার
আঘাতে আঘাতে কর মহৎ উদার।
শক্তি মোরে দাও, প্রভু, যেন চিত্তে মম
মানবে বরিতে পারি মোর ভ্রাতা সম!
শত্রুমিত্র ভেদাভেদ ভুলি' যেন, নাথ,
কল্যাণে মিলিতে পারি সকলের সাথ।
দারিদ্র্য, কেন কেন গো র'বে? কেন অত্যাচার
তোমার দয়ার রাজ্যে? কেন অবিচার
সুন্দর ভুবনে তব? হে আমার প্রভু,
প্রেমমাঝে হিংসা কেন জেগে রয় তবু?
দূর কর, দূর কর সর্ব আবর্জনা,
সকলের হ'য়ে মাগি তোমার মার্জনা।

An universal prayer.

ভারতের মানচিত্র

যোগীন্দ্রনাথ বসু

[**কবি পরিচিতিঃ** বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক ও কবি যোগীন্দ্রনাথ বসু ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর রচিত অসংখ্য পুস্তকের মধ্যে 'পৃথ্বীরাজ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবি মাইকেলের জীবনীও ইনি রচনা করেন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে কবির মৃত্যু হয়।]

শিক্ষক—হের বৎস! সম্মুখেতে প্রসারিত তব
ভারতের মানচিত্র, আমা সবাকার
পুণ্য জন্মভূমি এই, মাতৃস্তন্যে যথা,
এদেশের ফলে জলে পালিত আমরা।
কর প্রণিপাত তুমি, কর প্রণিপাত।
ছাত্র—(প্রণাম) ঐ যে চিত্রের শিরে সম মসীরেখা
পুরব-পশ্চিম ব্যাপি রয়েছে অঙ্কিত,
কি নাম উহার, দেব! বলুন আমারে।
শিক্ষক—নহে তুচ্ছ মসীরেখা, ওই হিমাচল
ভারতের পিতৃরূপী। জনক যেমন
স্নেহদানে তনয়ারে পালেন আদরে.
তেমতি এ হিমাচল দুহিতা ভারতে,
জাহ্নবী-যমুনা রূপা স্নেহ-ধারাদানে,
পালিছেন সযতনে! ওই হিমাচল
ভারতের তপঃক্ষেত্র ; কত সাধুজন,
বিরচি' আশ্রম সেথা, পূজি, ইষ্টদেবে,
লভিলা অভীষ্ট বর! সম্মুখেতে তব,
বিজয়-মুকুট সম এ অদ্রির শিরে,
শোভে ওই গৌরীশৃঙ্গ। দেখ বাম দিকে
ওই বদরিকাশ্রম, মহামুনি ব্যাস,

বসি যে আশ্রম মাঝে রচিলা পুলকে
অমর ভারত কথা ! অবিদূরে তার,
শোভিছে কেদারনাথ ; আচার্য শঙ্কর,
জীবনের মহাব্রত করি উদ্‌যাপন,
লভিলা সমাধি যথা। এই হিমাচল,
সাধু-পদ-রেণু বক্ষে ধরি যুগ যুগ
হইয়াছে পুণ্যভূমি ! কর নমস্কার।

ছাত্র—(প্রণাম) ওই যে চিত্রের বামে পঞ্চরেখাময়
শোভিছে সুন্দর দেশ, কি নাম উহার ?

শিক্ষক—ওই পঞ্চ নদ, বৎস ! এই পুণ্যভূমি
আর্যদের আদিবাস, সাম-নিনাদিত ;
কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত
পবিত্রিলা এই দেশ। এই পঞ্চনদে
হৃদয় শোণিত ঢালি' বীর পুরুরাজ
রক্ষিলা ভারত-মান। নিম্নদেশে তার
দেখ রাজপুত্র-ভূমি—মরুময় স্থান ;
কিন্তু প্রতি শৈলে তার, প্রতি নদী-কুলে,
রয়েছে অঙ্কিত বৎস ! অমর ভাষায়
বীরত্ব-কাহিনী, শত আত্ম-বিসর্জন !—
প্রতাপের দেশ এই, পদ্মিনীর ভূমি।

ছাত্র—ওই যে চিত্রের মাঝে কটিবন্ধসম
শোভিতেছে গিরি-রেখা, কি নাম উহার ?

শিক্ষক—এই বিন্ধ্যাচল, বৎস ? উত্তরে উহার
আর্যভূমি আর্যাবর্ত ! উহার দক্ষিণে
না ছিল আর্যের বাস, অরণ্য ভীষণ
ব্যাপিয়া যোজন শত আছিল বিস্তৃত,

নিবিড় আঁধারে পূর্ণ ! মহাপ্রাণ ঋষি
অগস্ত্য আর্যের বাস স্থাপিলা এদেশ ।
এবে জনপদ কত, পূর্ণ ধনে জনে
শোভিছে এ দেশ মাঝে । এ বনভূমে
আছিল দণ্ডকারণ্য ; রঘুকুলমণি
পালিবারে পিতৃসত্য জটা-চীর ধরি,
কাটাইল কাল যেথা । পুণ্য-প্রবাহিণী
গোদাবরী কল-কল মধুর নিনাদে,
"সীতারাম জয়" গীত গাহিয়া পুলকে
এখনো বহেন সেথা ! পবিত্র এ দেশ
সীতারাম-পদ-স্পর্শে ! কর নমস্কার ।

ছাত্র—(প্রণাম) গুরুদেব ! কৌতূহল বাড়িতেছে মম,
অতৃপ্ত শ্রবণযুগ, কৃপা করি তবে
কোথা বঙ্গভূমি, আজ দেখান আমারে !

শিক্ষক—ওই বঙ্গভূমি, বৎস ! হিমাদ্রি আপনি
মুকুট-আকারে হের শোভে শিরোদেশে
ধৌত করি পদতল বহেন জলধি,
নিত্য প্রক্ষালিত পুত ভাগীরথী জলে
'সুজলা', 'সুফলা', 'শ্যামা' । ভূষারূপে তার
হের ওই নবদ্বীপ, শ্রীচৈতন্য যেথা
হইলেন অবতীর্ণ ; সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে,
বিতরিয়া হরিনাম, পবিত্রিলা ধরা,
অমর করিলা জীবে । পশ্চিমে তাহার
দেখ শুষ্ক তনু ওই অজয়ের কূলে
শোভিতেছে কেন্দুবিল্ব, ধরিয়া আদরে
জয়দেব-অস্থি বুকে । নিম্নদেশে তার
সাগর-সঙ্গম ওই, পতিত-পাবনী

তরিতে সগরবংশ অবতীর্ণা যথা
মূর্তিমতী দয়ারূপে ! পবিত্র এ দেশ !
কর প্রণিপাত তুমি, বিধাতার কাছে
মাগ এই বর, বৎস, মাতৃসম যেন
পার পূজিবারে নিত্য বঙ্গভূমি-মায়ে !
ছাত্র—বিশাল এ চিত্র দেব ! কৃপা করি তবে
দেখান দ্রষ্টব্য যদি আরো কিছু থাকে ।
শিক্ষক—আছে শত শত, বৎস ! কি বর্ণিব আমি ?
বর্ণিলে জীবনকাল না ফুরাবে তবু ।
রত্নপ্রসূ মা মোদের । দেখিয়াছ তুমি
দেব-আত্মা হিমাচল, পাদ-মূলে তাঁর
দেখ শীর্ণকায়া ওই বহিছে রোহিণী,
হিমাদ্রি-দুহিতা সতী । তটদেশে তার
আছিল কপিলাবস্তু, পুণ্যময়ী পুরী
সিদ্ধার্থে ধরিয়া ক্রোড়ে । দেখ বামদিকে
অর্ধচন্দ্র-কায়া ওই জাহ্নবীর কূলে,
শোভিতেছে বারাণসী, হরিশ্চন্দ্র যথা
পত্নী, পুত্রে, আপনায় করিয়া বিক্রয়,
পালিলেন নিজ সত্য ! দেখ শিপ্রাকূলে,
অতীত-গৌরব-স্মৃতি-শিলা ধরি বুকে,
শোভিতেছে উজ্জয়িনী—বিক্রমের পুরী
বাজায়ে মধুর বীণা কালিদাস যথা
গাইলা অমর-গীত, ঝঙ্কার তাহার
এখনো উঠিছে, বৎস, দেশ-দেশান্তরে !
কি আর অধিক কব ? সন্তানের কাছে
জননীর প্রতি অঙ্গ তুল্য আদরের,—
নয়নে অমৃত-দৃষ্টি, কণ্ঠে মধুবাণী,

হৃদয়ে সুধার উৎস, ক্রোড় শান্তিময়,
করে প্রাণরূপী অন্ন, মহাতীর্থ পদ !
তেমতি জানিও বৎস, ভারত-ভূমির
প্রতি গিরি, প্রতি নদী, প্রতি জনপদ
পুণ্যময় মহাতীর্থ ; আছে বিমিশ্রিত
প্রতি রেণু মাঝে এর, প্রতি জলকণে
সাধুর পবিত্র অস্থি, সতীর শোণিত !
সামান্য এ দেশ নয়, বহু পুণ্যফলে
জন্মে নর এ ভারতে ! কিন্তু চিরদিন
রাখিও স্মরণ, বৎস, কর্মগুণে যদি
নাহি পার উজ্জ্বলিতে মাতৃভূমি-মুখ,
বৃথাই জনম তব ! কি বলিব আর।

A nice poem instructing India's history and geography in a novel manner.

সুখ

কামিনী রায়

[**কবি পরিচিতি ঃ** বাংলার মহিলা কবিদের অন্যতম কামিনী রায় বাংলাদেশের অন্তর্গত বরিশালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সহজ সরল ভাব-ব্যঞ্জনা এঁর কবিতার সেরা বৈশিষ্ট্য।]

নাই কি রে সুখ ? নাই কি রে সুখ ?
এ ধরা কি শুধু বিষাদময় ?
যাতনে জ্বলিয়া, কাঁদিয়া মরিতে
কেবলি কি নর জনম লয় ?
কাঁদাতেই শুধু বিশ্ব-রচয়িতা
সৃজেন কি নরে এমনই করে ?
মায়ার ছলনে উঠিতে পড়িতে
মানব-জীবন অবনী পরে ?
বল্ ছিন্ন বীণে বল্ উচ্চৈঃস্বরে,—
না—না—না মানবের তরে

স্বুখ

আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর,
না সৃজিলা বিধি কাঁদাতে নরে।
কার্যক্ষেত্রে ঐ প্রশস্ত পড়িয়া,
সমর-অঙ্গন সংসার এই ;
যাও বীরবেশে কর গিয়া রণ ;
যে জিনিবে সুখ লভিবে সে-ই।
পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন-মন সকলি দাও ;
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ,
'সুখ', 'সুখ' করি কেঁদ না আর ;
যতই কাঁদিবে ততই ভাবিবে
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।
'বিষাদ', 'বিষাদ', 'বিষাদ' বলিয়ে
কেনই কাঁদিবে জীবন ভরে ?
মানবের মন এত কি অসার ?
এতই সহজে নুইয়ে পড়ে ?
সকলের মুখ হাসি ভরা দেখে
পার না মুছিতে নয়ন-ধার ?
পরহিতব্রতে পার না রাখিতে
চাপিয়া আপন বিষাদ-ভার ?
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

To do something for others is happiness.

আদর্শ প্রশ্নাবলী

আত্মকাহিনী

১। 'এই দয়াময়ীর সৌম্য মূর্তি আমার হৃদয়মন্দিরে দেবমূর্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে।'—উক্তিটি কার? 'দয়াময়ী' কে? কেন তাঁর মূর্তি বক্তার মনে দেবমূর্তির মত বিরাজমান রয়েছে? যাঁর সম্বন্ধে উক্তিটি করা হয়েছে তাঁর চরিত্রের কি কি গুণ বক্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল?

২। 'আজ পথে যাইতে যাইতেই আমি ইংরাজি অঙ্কগুলি চিনিয়া ফেলিব।'—কে কখন কাকে এই উক্তিটি করেন? ইংরাজি অঙ্ক বক্তা প্রথম কোথায় দেখেন? বক্তা কিভাবে ইংরাজি অঙ্ক চিনলেন?

৩। 'দাদামহাশয়, আপনি ঈশ্বরের লেখাপড়া-বিষয়ে যত্ন করিবেন। যদি বাঁচিয়া থাকে, মানুষ হইতে পারিবেক।'—উক্তিটি কার? কার সম্বন্ধে কখন তিনি কাকে এই উক্তি করেন? এই উক্তি করার পিছনে কি কারণ ছিল? বক্তার উক্তি কি সার্থক হয়েছিল?

৪। নিচের শব্দগুলি দিয়ে এক একটি বাক্য রচনা কর:
কস্মিনকালে, অমায়িকতা, প্রত্যক্ষ, নিবারণ, কৌতূহলাবিষ্ট।

৫। পদান্তর কর:
সম্ভাষণ, হাস্য, বিস্মৃত, অণু, আহ্লাদিত, উৎকণ্ঠিত।

৬। স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর:

(ক) তাঁহার একমাত্র **পুত্র** গোপালচন্দ্র ঘোষ **আমার** প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন।

(খ) এই বলিয়া **তিনি আমাকে** ঐ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন।

(গ) একখানি **প্রস্তর** রাস্তার ধারে পোঁতা দেখিতে পাইলাম।

গঙ্গাতীরের শোভা

১। 'শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা, এমন আর কোথায় আছে?'—লেখকের বর্ণনা অনুসরণ করে গঙ্গাতীরের শোভার একটি নিখুঁত বর্ণনা দাও।

২। 'প্রাচীন ভাঙা ঘাটগুলির কি শোভা!'—কোন নদীর ঘাটের কথা এখানে বলা হয়েছে? লেখকের বর্ণনা অনুসরণে সেই ঘাটগুলির শোভার বর্ণনা দাও।

৩। 'তাহারা নিজেরাই জটাজুটবিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষির মত অতিশয় ভক্তিভাজন ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে।'—কিসের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লেখক এই মন্তব্য করেছেন? কেন সেগুলি ভক্তিভাজন হয়ে উঠেছে? ঐগুলির এবং তৎসন্নিহিত লোকালয়গুলির বর্ণনা দাও।

৪। নিচের বাক্যগুলির অর্থ পরিস্ফুট কর:

(ক) এই অনুর্বরতা ও বন্ধুরতার মধ্যে পাঁজাগুলো কেমন হতভাগ্যের মত দাঁড়াইয়া থাকে।

(খ) এ পারে নিদ্রার রাজ্য, আর ওপারে স্বপ্নের দেশ বলিয়া মনে হইতে থাকে।

৫। 'সূর্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই, সে বাংলার সৌন্দর্য দেখে নাই।'—কে কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি করেছেন? লেখক কি সৌন্দর্য দেখেছিলেন? কেন এই সৌন্দর্য সম্বন্ধে লেখক এই উক্তি করেছেন?

৬। নিচের শব্দগুলি দিয়ে এক একটি বাক্য রচনা কর:

মাহাত্ম্য, শ্রেণীবদ্ধ, নিস্তরঙ্গ, রহস্যময়, নির্বাপিত, কলরব।

৭। পদান্তরিত কর:

নির্মিত, সমুদ্র, বন্ধুরতা, সৌন্দর্য, নির্বাপিত, অবিশ্রাম, চন্দ্র।

৮। সন্ধি বিচ্ছেদ কর:

সন্ধ্যালোক, নিস্তরঙ্গ, স্বর্ণচ্ছটা।

অদৃশ্য বিচারক

১। 'ঠ্যাঙাড়েদের কার্যপ্রণালী ছিল অদ্ভুত ধরণের'—ঠ্যাঙাড়ে কারা? তাদের কার্যাবলী কি ধরণের ছিল তা বর্ণনা কর।

২। 'গত বৎসর দেশের ঠাকুরঝি পুকুরের মাঠে প্রায় এই সময়ে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেন অদৃশ্য বিচারক এ বৎসর ইছামতীর নির্জন চরে তাহার বিচার সম্পন্ন করিলেন।'—গত বছরের ঘটনাটি বিবরণ দাও। এ বছর ইচ্ছামতীর

নির্জন তীরেই বা কি ঘটনা ঘটল? অদৃশ্য বিচারকটি কে? কিভাবে তিনি গত বছরের ঘটনার বিচার এ বছর করলেন?

৩। 'অদৃশ্য ধর্মাধিকরণের দণ্ডকে ঠাকুরঝি পুকুরের শ্যামাঘাসের দামে প্রতারিত করিতে পারে না, অন্ধকারেও তাহা আপন পথ চিনিয়া লয়।'—অদৃশ্য ধর্মাধিকরণটি কে? তাঁর দণ্ডকে কে কিভাবে প্রতারিত করতে চেয়েছিল? কিভাবে সেই প্রতারণার অপমৃত্যু হল?

৪। নিচের স্থূলাকার পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর:

(ক) বীরু রায়ের একমাত্র **পুত্র** নৌকাতে ছিল।

(খ) পথের বিপদ **তাঁহার** অবিদিত ছিল না।

(গ) **ছেলেও বাবার** পিছু পিছু ছুটিল।

৫। পদান্তর কর:

সঞ্চয়, অপহরণ, আশঙ্কা, প্রতারিত।

৬। নিচের শব্দগুলি দিয়ে এক একটি বাক্য রচনা কর:

বিপদসঙ্কুল, সুনিপুণ, দিগন্তবিস্তৃত, অবস্থাপন্ন, নিরুপায়।

লণ্ডন শহর

১। 'কিন্তু শহরের ভিতরকার জল কলকাতার গঙ্গার মতো বিবর্ণ।'—কলকাতার সঙ্গে এখানে কোন শহরের তুলনা করা হয়েছে? কলকাতার সঙ্গে এই শহরের কোথায় সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য আছে?

২। 'শৃঙ্খলা মেনে চলা যেন এদের দ্বিতীয় প্রকৃতি।'—কাদের কথা বলতে গিয়ে লেখক এই উক্তি করেছেন? যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের শৃঙ্খলা-পরায়ণতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও।

৩। এই প্রবন্ধ অনুসরণ করে লণ্ডনের মাঠ বা পার্কগুলির বিচিত্র দৃশ্যসমূহের একটি নিখুঁত বর্ণনা দাও।

৪। 'ফুল নয় তো ফুলবাবু'—লেখক কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি করেছেন? লণ্ডনের ফুলকে 'ফুলবাবু' বলে বর্ণনা করার কারণ কি?

৫। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:

(ক) লণ্ডন শহরের পত্তন কবে হয়?

(খ) লণ্ডনের ধনীরা কোথায় বাস করেন?

(গ) সঙ্গতি থাকলেও লণ্ডনের লোকে রেস্তোরাঁয় খায় কেন ?

(ঘ) লণ্ডনে ভিক্ষুকরা ভিক্ষে করার জন্য কি ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করে ?

৬। 'নিষ্ক্রিয়তাকে এ দেশে ধর্ম বলে না'—উদাহরণ দিয়ে লেখকের এই বক্তব্যকে পরিস্ফুট কর।

৭। পদান্তর কর :

সোনালী, কৃত্রিম, নিষ্ক্রিয়তা।

৮। নিচের শব্দগুলি দিয়ে এক একটি বাক্য রচনা কর :

বুভুক্ষু, বিবর্ণ, অতুলনীয়, কেন্দ্রস্থল, পত্তন, কলরোল।

বিদ্যাসাগর

১। 'যার যোগ্যতা নেই, তাকে পাস করানো মানে বিশ্বাসঘাতকতা করা'—কে কখন কাকে এই উক্তি করেন ? এই উক্তির মধ্য দিয়ে বক্তার চরিত্রের কি পরিচয় পেলে ?

২। 'যে সন্তান মায়ের আদেশ পালন করতে না পারে, সে নরাধম।'—বক্তা কে ? কখন তিনি এই কথা কাকে বলেন ? এই উক্তির মধ্য দিয়ে বক্তার মাতৃভক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায় একটি ঘটনার সাহায্যে তা পরিস্ফুট কর।

৩। লিঙ্গ পরিবর্তন কর :

মা, স্ত্রী, ছাত্র, ইনসপেকটর।

৪। নিচের শব্দগুলি দিয়ে একটি বাক্য রচনা কর :

অনুগ্রহ, অধ্যয়ন, উৎকৃষ্ট, অভিরুচি, আন্দোলন।

৫। পদান্তর কর :

শাস্ত্রীয়, দুঃখিত, নিয়ন্ত্রণ।

নিউটনের কীর্তি

১। 'গ্যালিলিওর নাম পণ্ডিতসমাজে বিখ্যাত।'—গ্যালিলিও কে ? কোন দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ? কেন তাঁর নাম পণ্ডিতসমাজে বিখ্যাত ?

২। 'কিন্তু নিউটন তাঁহার অপেক্ষাও বড় লোক।'—নিউটন কে ? 'তাঁহার' বলতে এখানে কার কথা বলা হয়েছে ? কেন তিনি ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় ?

৩। 'কিন্তু এই গল্প নিউটনের খ্যাতি না বাড়াইয়া বরং কমাইয়া দেয়।'—

কোন গল্পের কথা লেখক এখানে বলেছেন ? সেই গল্প থেকে কোন আবিষ্কারের কথা জানা যায় ? কেন তা নিউটনের খ্যাতি কমিয়ে দেয় ?

৪। চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে।'—এই উক্তির মধ্য দিয়ে লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন ? সত্যি সত্যিই কি চাঁদ পৃথিবীর দিকে পড়ে ?

৫। মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব বলতে কি বোঝায় ? নিউটন কিভাবে এই তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেন ? একটি উদাহরণ দিয়ে মধ্যাকর্ষণের তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা কর।

৬। 'স্থূলভাবে সহজ কথায় নিউটনের এই নীতিকথা তোমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম।'—উক্তিটি কার ? নীতিকথাটি কি ? কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে দাও।

৭। পদান্তর কর :

পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, জগৎ।

৮। নিচের শব্দগুলি দিয়ে এক একটি বাক্য রচনা কর :

আকর্ষণ, স্থূল, অব্যাহতি, ক্রমাগত, রজ্জুবদ্ধ, বাহাদুরি।

শ্রীরামকৃষ্ণ

১। 'কখন সূর্য উদয় হইল, কখন বা অস্ত গেল, তাহা আমি জানিতে পারিতাম না।'—কে কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি করেছেন ? বক্তার জীবনে এই ভাবের উদয় হয়েছিল কি করে ?

২। 'শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধটি অনুসরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। 'এইরূপ ব্যক্তির এক্ষণে প্রয়োজন—এই যুগে এইরূপ লোকের আবশ্যক।' —বক্তা কে ? 'এইরূপ ব্যক্তিটি' কে ? কেন তাঁহাকে এখন প্রয়োজন ? তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য কি ছিল ?

৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) শ্রীরামকৃষ্ণ কবে জন্মগ্রহণ করেন ?

(খ) কিভাবে নিজ স্বরূপের রহস্য তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হয় ?

(গ) শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে উপদেশ দিতেন ?

(ঘ) কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধিস্থ হন ?

৫। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :

জ্ঞানান্বেষণ, দিবাবসান, প্রত্যক্ষানুভূতি, অভ্যুদয়।

৬। নিচের শব্দগুলি দিয়ে এক একটি বাক্য রচনা কর :

উদ্ঘাটিত, অনিবার্য, সামঞ্জস্য, ঐক্য।

৭। স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :

(ক) এইরূপে সেই **মহাপুরুষ আমাদিগকে** ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

(খ) এইরূপ **পিতামাতা** হইতে এই **শিশু** জন্মগ্রহণ করেন।

(গ) **মন্দিরে** আনন্দময়ী মাতার একটি **মূর্তি** ছিল।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র

১। 'ইংরেজ স্বেচ্ছায় ভারত ছেড়ে যায়নি। এর মূলে ছিল প্রধানতঃ দুটি কারণ।'—ইংরেজের ভারত ছেড়ে যাওয়ার মূলে যে দুটি কারণ রয়েছে তা বর্ণনা কর।

২। 'ফলে সুভাষের পরবর্তী জীবন গড়ে উঠেছিল দুটি ধারায়।'—কোন দুটি ধারার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে? ধারাদুটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। 'সেখানে তিনি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করেন।'—কার কথা এখানে বলা হয়েছে? কোথায় তিনি স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করেন? কিভাবে? এই সরকার গঠনের পর কি ঘটনা ঘটে?

৪। 'মহান নেতার এ মৃত্যু বিশ্বাসযোগ্য নয়।'—নেতাটি কে? কেন তাঁকে মহান বলা হয়েছে? কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলা হয়? কেন দেশবাসী তাঁর মৃত্যুর সংবাদ বিশ্বাস করে না?

৫। পদান্তর করে বাক্য রচনা কর :

নিরুদ্দিষ্ট, রূপান্তরিত, অধিকার, নির্বাচিত, শিথিল, বহিষ্কৃত, বৈরাগ্য, প্রহার, ঐতিহাসিক।

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) সুভাষচন্দ্রের পিতার নাম কি ছিল?

(খ) কোন কলেজ থেকে সুভাষচন্দ্র বি. এ. পাশ করেন?

(গ) নেতাজী প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলটির নাম কি?

(ঘ) 'দিল্লি চলো' অভিযান কবে হয়েছিল?

প্রাচীন বাংলার শিল্প ও বাণিজ্য

১। 'এই ধর্ম তন্ত্রাচারসর্বস্ব'—কোন ধর্মের কথা এখানে বলা হয়েছে? তন্ত্রাচার কি? এই সময়ে আর কি কি ধর্মের প্রচলন কি?

২। 'সপ্তম শতাব্দীতে যখন চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ ভারতে আসেন, তখন তাঁর লেখায় বাংলা দেশের প্রচুর উল্লেখ ছিল।'—হিউয়েন সাঙ কে? কোন সময়ে তিনি ভারতে আসেন? বাংলাদেশ সম্বন্ধে তিনি কি লিখে গিয়েছেন? বাংলায় তখন কি কি জিনিসের পঠন-পাঠন হত?

৩। ধোয়ী কে? তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থটির নাম কি? কোন সময়ে তিনি কাব্যটি লিখেছিলেন? পাল রাজধানী রামাবতী প্রসঙ্গে কবি কি বলেছেন?

৪। প্রাচীন বাংলায় কি কি শিল্প প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল? সে সব শিল্পের বিস্তৃত বর্ণনা দাও।

৫। 'বাংলার বাণিজ্য শুধুমাত্র দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না'—প্রাচীন বাংলার বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করে উক্তির যথার্থতা প্রমাণ কর।

৬। নিচের শব্দগুলি দিয়ে এক একটি বাক্য রচনা কর:

সৌরভ, লুব্ধক, স্থিতিস্থাপকতা, অপাংক্তেয়, অর্বাচীন, প্রতীয়মান, জগদ্বিখ্যাত।

এভারেস্ট বিজয়

১। 'ভারবাহী শেরপাদের বাদ দিয়ে হিমালয়ের এই শেষ অভিযানে… তেরজন নির্ধারিত পর্বত-আরোহী ছিলেন'।—কোন অভিযানের কথা এখানে বলা হয়েছে? এই অভিযানের নায়ক কে ছিলেন? তেরজন পর্বতারোহীর নাম কি? অভিযানের যাত্রা-কেন্দ্র ছিল কোন জায়গা? অভিযানের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন কারা?

২। 'তাঁর একটা সর্ত আছে, সে সর্ত মেনে না নিলে তিনি এই অভিযানে যোগদান করবেন না।'—কার কথা এখানে বলা হয়েছে? সর্তের কথা তিনি কাকে বলেন? সর্তটি কি ছিল? কোন সভায় সেই সর্তকে স্বীকার করা হয়?

৩। 'তখন বাধ্য হয়ে তাঁরা কম মাত্রায় অক্সিজেন নিতে লাগলেন।'—কোন

প্রসঙ্গে কাদের কথা এখানে বলা হয়েছে ? কোন পরিস্থিতিতে তাঁরা অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দিলেন ? পরিস্থিতির বিশদ বর্ণনা দাও।

৪। 'তেনজিং আর হিলারী সেই তুষার-নীড়ে কম্পিতবুকে রাত-প্রভাতের অপেক্ষায় রইলেন।'—তেনজিং আর হিলারী কে ? কোন অভিযানে তাঁরা অংশ গ্রহণ করেন ? কিসের জন্য তাঁরা রাত-প্রভাতের অপেক্ষা করছিলেন ? 'কম্পিত বুকে' অপেক্ষা করার কারণ কি ?

৫। 'এভারেস্টের চূড়ায় কে প্রথমে উঠেছিলেন, এই নিয়ে বহু বাদানুবাদ হয়।'—কে প্রথম এভারেস্টের চূড়ায় ওঠেন ? কিভাবে ? চূড়ায় ওঠার পর তিনি কি বললেন ?

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) এভারেস্ট অভিযানকে কয় ভাগে ভাগ করা হয় ? প্রতিটি ভাগে কারা কারা ছিলেন ?

(খ) থায়াংবক কোথায় ? কেন এখানে অভিযান তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করে ছিল ?

(গ) এভারেস্ট অভিযানের আট নম্বর তাঁবু কত উচ্চতায় ফেলা হয়েছিল ?

৭। পদান্তর কর :

আমন্ত্রণ, স্নিগ্ধ, স্বীকার, অধিকার, নির্ধারিত, ভীত, অবিশ্রান্ত।

৮। নিচের পদগুলি দিয়ে এক একটি বাক্য রচনা কর :

বাদানুবাদ, পদার্পণ, ইষ্টদেবতা, দুর্গমতা, আত্মনিয়োগ।

৯। স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :

(ক) **কাঠমাণ্ডু** থেকে **অভিযান** যাত্রা করল নামচেবাজারের দিকে।

(খ) **বৌদ্ধ শ্রমণেরা** অভিযাত্রীদের **আশীর্বাদ** করলেন।

(গ) তখন বাধ্য হয়ে **তাঁরা** কম মাত্রায় **অক্সিজেন** নিতে লাগলেন।

দেশের শ্রীবৃদ্ধি

১। 'দেশের বড় মঙ্গল—তোমরা একবার মঙ্গলের জন্য জয়ধ্বনি কর।'—উক্তিটি কার ? কোন পত্রিকায় কথাগুলি তিনি লেখেন ? কার রাজত্বে দেশের কি কি মঙ্গল হয়েছে, লেখকের মন্তব্য অনুসরণ করে তা বিবৃত কর।

২। 'তাহা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের কি উপকার হইয়াছে?'—হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত কে? তারা কিভাবে দিনযাপন করে? দেশের শ্রীবৃদ্ধির কোন প্রভাব তাদের উপর পড়েছে কি?

৩। 'যেখানে কৃষকদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের মঙ্গল নাই।'—এটি কার উক্তি? কৃষকদের সঙ্গে দেশের মঙ্গলের সম্পর্ক যে জড়িত, লেখক কিভাবে তা প্রমাণ করেছেন? এই উক্তিটি কি এখনকার ভারতবর্ষ সম্পর্কেও করা চলে?

৪। নিচের শব্দগুলি দিয়ে এক একটি বাক্য রচনা কর:
পর্যবেক্ষণ, নিবারণ, বিনীত, অগ্নিময়ী, আবাস।

বাঙ্গালীর শিল্পোত্তম

১। এই প্রবন্ধটির মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার শিল্পপতিদের যে পরিচয় পেলে নিজের কথায় তার বর্ণনা দাও।

২। বাঙ্গালীরা ব্যবসায়ী হয়েছে, অথচ শিল্পপতি হয়নি কেন? এ সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য কি?

৩। নিম্নলিখিতগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও:
রাঢ় অঞ্চল, ধনপতি সদাগর, চণ্ডীমঙ্গল।

একলব্য

১। 'একলব্য গুরুভক্তি দেখিয়া নয়নে।
স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে॥'

—একলব্য কে? তাঁর গুরু কে? কিভাবে তিনি গুরুভক্তির প্রমাণ দিলেন? স্বর্গ থেকে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করলেন কেন?

২। গদ্যরূপ বল:
অগ্রেতে, মম, তুষিবা, দিবা।

৩। নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য রচনা কর:
কৃতাঞ্জলি, অঙ্গীকার, গুরুভক্তি, সদয়, পুষ্পবৃষ্টি।

জন্মভূমির প্রতি

১। 'জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা হবে ?'

—কোন চিরসত্যের প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে ? কেন কবি এই উক্তি করেছেন ? কবির মতে কি করলে মানুষ অমর হতে পারে ?

২। 'জন্মভূমির প্রতি' কবিতায় কবি জন্মভূমির কাছে কি প্রার্থনা করেছেন ?

৩। নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য রচনা কর :

মিনতি, প্রবাস, শমন, মধুময়।

বঙ্গেশরৎ

১। 'আজি কি তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে।'

—'তোমার' বলতে কার কথা এখানে বলা হয়েছে ? শারদ-প্রভাতে কবি তাঁর কি রূপ দেখলেন ?

২। শরতের আবির্ভাবে কবির মনে যে ভাবের উদয় হয়েছে 'বঙ্গে শরৎ কবিতাটি অবলম্বনে তা বিবৃত কর।

৩। নিচের পংক্তিগুলির বক্তব্য পরিস্ফুট কর :

(ক) 'মাতার কণ্ঠে শেফালী মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী।'

(খ) আলোকে শিশিরে কুসুম ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী।

৪। নিচের শব্দগুলির গদ্যরূপ লেখ :

মুরতি, হেরিনু, কোয়েল, ছুটায়ে, দিশি, হরিতে, উড়ায়ে।

ঝিঙে ফুল

১। 'ঝিঙে ফুল' কবিতায় কবি ঐ ফুলের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে কোন কোন জিনিসের সঙ্গে কিভাবে তুলনা করেছেন ? ঐগুলির বিশদ উল্লেখ করে ঝিঙে ফুলের সৌন্দর্যের বর্ণনা দাও।

২। 'চাই না এ অলকায়—
ভাল এই পথ-ভুল।'

—কে কার প্রতি এই উক্তি করেছে ? 'অলকা' কি ? কেন বক্তা অলকায় যেতে চাইছে না ? পথ ভুলে সে কোথায় এসেছে ? কেন তার এই পথ-ভুল ভালো ?

রাখাল ছেলে

১। 'খেলা মোদের গান-গাওয়া, ভাই, খেলা লাঙল চষা,
সারাদিন ছুটোছুটি জানিইনেকো বসা।'

—উক্তিটি কার ? সারাদিন সে খেলার মাধ্যমে কিভাবে প্রয়োজনীয় কাজগুলি সারে ?

২। গদ্যরূপ লেখ :

গাঁ, সাঁঝ, নাও, নিড়িয়ে, চষতে, মোরে।

রানার

১। রানার কে ? তার কাজ কি ? কবি এই কবিতায় তার সুখ ও দুঃখের কাহিনী কিভাবে বর্ণনা করেছেন ?

২। 'এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ'—কার কথা এখানে বলা হয়েছে ? তার জীবনের দুঃখ কি ? কেন তার দুঃখ কেবল পথের তৃণ জানবে ?

৩। নিচের শব্দগুলি দিয়ে এক একটি বাক্য রচনা কর :
দিগন্ত, দুর্বার, দুর্জয়, সহানুভূতি, দুর্দম।

ভাড়াটে কুঠি

১। কবি এই কবিতার ভাড়াটে বাড়ির কোন কোন বিশেষত্বের উল্লেখ করেছেন ? কবি এই বিশেষত্বগুলোকে কি পছন্দ করেন ?

২। 'শুধু কোনদিন সঙ্গবিহীন বিদ্রোহ করে প্রাণ'—কোন প্রসঙ্গে কিসের কথা বলতে গিয়ে কবি এই উক্তি করেছেন ? প্রাণ 'সঙ্গবিহীন' হয়ে পড়ে কেন ? কেনই বা তা বিদ্রোহ করে ?

৩। নিচের পংক্তিটির অর্থ পরিস্ফুট কর :
ঘোচে না আড়াল, ব্যাকুল হৃদয়
মিছে মরে মাথা কুটি।

ছিন্ন-মুকুল

১। 'ছিন্ন মুকুল' বলতে কবি এখানে কার কথা উল্লেখ করেছেন ? সে না থাকায় যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা বর্ণনা কর।

২। 'হারিয়ে গেছে বোল্ বোলা সেই বাঁশী'—কার কথা এখানে বলা হয়েছে ? 'বোল্ কি ? 'বাঁশীটি' হারিয়ে যাওয়ার যে শোকাবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা দাও।

৩। গদ্যরূপ বল :

তরাসে, আঁধার।

কামনা

১। কবি এই কবিতায় কার কাছে কি প্রার্থনা করেছেন ? এর 'কামনা' নামটি সার্থক হয়েছে কি ?

২। 'দূর কর, দূর কর সর্ব আবর্জনা,
সকলের হ'য়ে মাগি তোমারি মার্জনা।'

—কে কার প্রতি এই উক্তি করেছেন ? আবর্জনাগুলো কি কি ? কেন কবি উদ্দিষ্টের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করছেন ?

ভারতের মানচিত্র

১। 'ওই হিমাচল ভারতের পিতৃরূপী।'—হিমাচল কি ? কোথায় তার অবস্থান ? তাকে ভারতের পিতৃরূপী বলা হয়েছে কেন ? এখানকার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি ?

২। 'এই পঞ্চনদে
হৃদয়-শোণিত ঢালি' বীর পুরুরাজ
রক্ষিলা ভারত-মান।'

—পঞ্চনদ কোথায় ? সেখানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কি ? পুরু কে ? কিভাবে তিনি ভারতের মান রাখেন ?

সাঃ পঃ—৭

৩। 'সীতারাম জয়' গীত গাহিয়া পুলকে
এখনো বহেন সেথা।'

—সীতা-রাম কারা ? কে তাঁদের জয়গান গায় ? ভারতের মানচিত্রে তার অবস্থান কোথায় ? তার বৈশিষ্ট্যই কি কি ?

৪। কবি এই কবিতায় মানচিত্রে বঙ্গভূমির অবস্থান কিভাবে বর্ণনা করেছেন ? এখানে কোন কোন মহাপুরুষ অবতীর্ণ হয়েছেন ? কি কি কাজ করে তাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন ?

৫। 'সামান্য এ দেশ নয়, বহু পুণ্যফলে
জন্মে নর এ ভারতে !'

—ভারতকে কেন অসামান্য দেশরূপে বর্ণনা করা হয়েছে ? এই দেশের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। এদেশে যে জন্মায়, সে পুণ্যবান বলে বিবেচিত হয় কেন ?

৬। 'গাইলা অমর গীত, ঝঙ্কার তাহার
এখনো উঠিছে, বৎস, দেশ-দেশান্তরে।'

—কার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ? কি অমর-গীত তিনি গেয়েছিলেন ? কোথায় তাঁর বাস ছিল ? কার রাজত্বকালে তাঁর আবির্ভাব হয় ?

৭। নিম্নলিখিতদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :

ব্যাস, শঙ্কর, পদ্মিনী, অগস্ত্য, শ্রীচৈতন্য, জয়দেব, সিদ্ধার্থ, হরিশ্চন্দ্র।

৮। পদান্তর করে বাক্যে প্রয়োগ কর :

প্রণাম, ঘন, তুচ্ছ নমস্কার, স্থান, ভীষণ, ধৌত।

৯। লিঙ্গান্তর কর :

পুণ্যময়, সতী, আচার্য, ছাত্র, পিতৃরূপী, তনয়া, জনক।

১০। গদ্যরূপ লেখ :

হের, বিবচি, পালিছেন, লভিলা, স্থাপিলা, বিতরিয়া, বর্ণিব, মাগ।

সুখ

১। 'তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

—কোন সুখের কথা এখানে বলা হয়েছে ? কেন সেই সুখকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে ? কবি কেন নিজের কথা ভুলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ?

২। 'সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেককে আমরা পরের তরে।'

—'সুখ কবিতাটি অবলম্বনে কবির এই উক্তির বক্তব্যকে পরিস্ফুট কর।

৩। কবির মতে শ্রেষ্ঠ সুখ কি ? 'সুখ' কবিতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

———